শ্রীঅরবিন্দের গীতা

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখিত Essays on the
Gita পুস্তকের অনুবাদ)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়,
গুইর, কৈয়র পোঃ, বর্দ্ধমান।

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস
২৩।১ বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

মা,

জন্মিয়া অবধি তোমার চরণে কত অপরাধ করেছি, তোমার প্রাণে কত ব্যথা দিয়েছি—তবু তোমার স্নেহ কোন দিন কম করে দাওনি! তোমাকে সংসারে সুখী করবার আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পুত্রকন্যার শোকে তোমার হৃদয় জর জর। গীতাতে সকল শোকের শান্তি আছে, আত্যন্তিক সুখের সন্ধান আছে, কেমন করিয়া সংসারের সকল ঘটনা, সকল জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব মিলনের মধ্যে ভগবানের শুভ ইচ্ছা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারা যায় তাহার সন্ধান আছে তাই এই বইখানি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। অকৃতী সন্তানের এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

তোমার চির স্নেহাশ্রিত

অনিল

নিবেদন

ভারতে নবজাতি গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে হইবে এবং ইহার জন্য গীতা শিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত উপযোগী। ইহা উপলব্ধি করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পণ্ডিচারীতে তাঁহার নির্জ্জন সাধন মন্দিরে বসিয়া গীতা হইতে যে সকল তথ্য সাধন বলে উদ্ধার করিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন শুধু ভারতবাসীর পক্ষে নহে, সমস্ত জগৎবাসীর পক্ষেই তাহা কল্যাণকর হইবে। তাই যেদিন শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী গ্রন্থ Essays on the Gita বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি পাই সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের বহি এখনও শেষ হয় নাই; আরও খণ্ড বাহির হইবে। তিনি বঙ্গানুবাদটিও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেওয়ায় প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম।

যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করান, তাঁহারই কৃপায় যদি আমার দ্বারা গীতা শিক্ষা প্রচারের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয় তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক মনে করিব।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১
কলিকাতা।

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ রায়

"সারথি"তে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের গীতা নিয়মিত পাঠ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচারী হইতে জানাইয়াছেন—"অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা আপনার অনুবাদের সাহায্যে সহজেই গীতা বুঝিতে পারিবে।"

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

PUBLIC LIBRARY
1886

PUBLIC LIBRARY
১৩৪৩

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

প্রথম অধ্যায়

গীতার উপযোগীতা

জগতে বহু ধর্ম্মগ্রন্থ, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে যে সকল লোকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাহারা ভাবেন একমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, আর সব জুয়াচুরি বা ভ্রান্ত। অনেক সময় বিজ্ঞ দার্শনিকেরাও মনে করেন যে তাহাদের মতই জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা। তবে আজকাল মানুষ এ বিষয়ে একটু নরম হইতেছে। এখন আর আমরা অস্ত্রের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করি না, মতের সহিত না মিলিলে আমরা কাহাকেও পোড়াইয়া মারিতে চাহি না। এখন আমরা শিখিয়াছি যে সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে—সকল মতে, সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য থাকিতে পারে। তবে এখনও অনেকের এই অভিমানটুকু আছে যে অন্যত্র আংশিক সত্য থাকিলেও—আমাদের যাহা তাহাই অখণ্ড পূর্ণ সত্য এবং তাহা ছাড়া গতিমুক্তির আর পথ নাই। আমরা যে ধর্ম্মগ্রন্থের আদর করি, যে দার্শনিক মত পোষণ করি তাহার সবটাই আমরা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাই—এতটুকু ছাঁটিয়া দিতেও আমরা নারাজ।

অতএব, বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে হইলে আমরা এগুলিকে কি চক্ষুতে দেখি এবং কোন সময়ের

সমাধানে ইহাদের উপযোগিতা কতটা উপলব্ধি করি, সর্ব্বাগ্রে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

সত্য যে এক এবং সনাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর সত্য, মুসলমানের সত্য, খৃষ্টানের সত্য ভিন্ন নহে। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য ছিল তাহা আজও সত্য। তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে এক সনাতন সত্য বিভিন্নরূপ ধারণ করে;—আবার, সেই এক সনাতন সত্য হইতে অন্য অনেক সত্য উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে সবই কোন এক বিশেষ গ্রন্থে বা কোন এক বিশেষ অবতারের দ্বারা নিঃশেষে কথিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সত্যজ্ঞান যাহা কিছু লাভ করিবার আছে তাহার সবই যে গীতায় আছে তাহা আমরা বলি না। আবার গীতার ভিতর যাহা আছে তাহার সবই যে সকল দেশ, সকল কালের জন্য সত্য তাহাও আমরা বলি না।

তবে কোন বিশেষ কাল বা স্থানের বাহিরে প্রযুজ্য নহে এমন কথা গীতাতে খুব কমই আছে এবং যেখানে এরূপ কথা আছে সে গুলিও সহজেই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের করিয়া লওয়া যাইতে পারে অথচ তাহাতে গীতার কোন হানি হয় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মানব যজ্ঞদানের দ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, দেবতারা তুষ্ট হইয়া বৃষ্ট্যাদি দানে মানুষের পোষণ করিবে—এইরূপ পরস্পরের আদান প্রদানে সকলের অভীষ্ট লাভ হইবে! প্রাচীন ভারতে এইরূপ প্রথা, যজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু এখন ভারত হইতেই ইহা একরকম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবতারা ঘৃতাহুতিতে তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান করে, এই বিজ্ঞানের যুগে লোকে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু, পুরাকালে

প্রচলিত যজ্ঞপ্রথা অবলম্বন করিয়া গীতায় এখানে যে সত্য উক্ত হইয়াছে তাহা সার্ব্বজনীন। পরস্পরের আদান প্রদানে শুধু মানব সমাজ নহে—এই বিশ্ব প্রকৃতিই যে টিকিয়া আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করিবেন এবং গীতাকথিত যজ্ঞের অর্থ এইরূপ আদান প্রদান ধরিয়া লইলে গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না। জননীর আত্মদানে সন্তানের সৃষ্টি হইতেছে। বৃক্ষলতা মাটি, জল, বায়ু হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জীব জন্তুর আহার যোগাইতেছে, জীব জন্তু মরিয়া লতা বৃক্ষের সার হইতেছে। সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রকে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে—গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণের দ্বারা সৌর মণ্ডলকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে—মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে ইহাই প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র! ইহাতেই সকলে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে! যে ব্যক্তি জীবের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য কিছু দান না করিয়া শুধু নিজের ইন্দ্রিয় সুখভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে—

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবিত।

পাপময় জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।—

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ

যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে!

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ"—"অতএব ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য, এই তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ!" এখানে শাস্ত্র বলিতে যদি ভারতে তৎকালে প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি মাত্র ধরা যায় তাহা হইলে গীতাকে খুব সঙ্কীর্ণ করা হয়।—মানুষের মনে কত সময় কত কামনার উদ্রেক

হইতেছে, "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে।" যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই করিলে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই মানুষ নিজেদের কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের জন্য বিচার যুক্তির দ্বারা কতকগুলি বিধি স্থির করিয়াছে। এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু কাম ক্রোধের বশে কার্য্য না করিয়া এই সকল বিধি নিষেধ মানিয়া কার্য্য করিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই সংযত হয় এবং সেই জন্যই এই সকল বিধি নিষেধকে শাস্ত্র বলা হইয়াছে। তাই, গীতা যখন বলিয়াছে শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিন্দু সমাজে যাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। খৃষ্টান যথেচ্ছাচারী না হইয়া খৃষ্টান শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করুক, মুসলমান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে মুসলমান শাস্ত্রের অনুসরণ করুক, হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্রবিধি মত কার্য্য করুক—মোটকথা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পরিবর্ত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধকে কার্য্যাকার্য্যের মানদণ্ড ও প্রবর্ত্তক করুক তাহা হইলেই তাহাদের সদগতি লাভ হইবে।

গীতায় যে চারিবর্ণের বিভাগ দেওয়া আছে জগতে তাহা এখন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই চারিবর্ণ বিভাগ একটি আধ্যাত্মিক সত্যের বাহ্যিক আকার মাত্র। সে সত্য এক যুগে এক আকার ধারণ করিয়াছিল। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম ও কর্ম্মের ধারা আছে, প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং কর্ম্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশই ব্যক্তিগত বা জাতিগত

সার্থকতা। প্রাচীনকালে এইরূপ বৈশিষ্ট্যানুসারে সমাজকে চারি ভাগ করা চলিত। এখন সমাজের কর্ম্ম বাড়িয়া যাওয়ায় প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও বাড়িয়া গিয়াছে—ফলে সে চারিবর্ণ বিভাগের আর কোনও সার্থকতা নাই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতির যে একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করিতে পারিলেই যে পরমার্থ লাভ হইতে পারে গীতাপ্রচারিত এই সত্য, সর্ব্বকাল সর্ব্ব যুগেরই উপযোগী।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা হইতে আমাদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হইয়াছে। যে সত্য যে ভাবে তাহাদের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল, উহা তাহারা যেমন বুঝিয়াছিলেন—আমাদের পক্ষে তাহা ঠিক সেই ভাবে বুঝা অসম্ভব।—অতএব, গীতার ন্যায় একখানি পুরাতন গ্রন্থের অর্থ লইয়া যে মতভেদ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। গীতাকে লইয়া কত বিভিন্ন ভাষ্য, বিভিন্ন টীকা রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে ইহা হইতে বুঝা যায় যে গীতা কথিত দার্শনিক তথ্য সমূহের ঠিক অর্থ বোঝা এখন আর সম্ভব নহে।

তবে, কিসের জন্য আমরা গীতা পড়িব? দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করিবার নিমিত্ত গীতা পাঠের কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। যে সকল সত্য শুধু বুদ্ধিগম্য নহে—যোগলব্ধ দৃষ্টিতেই যেগুলি জানিতে পারা যায়—যাহা হইতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়তা পাইতে পারে—এইরূপ সত্যসমূহের সন্ধান গীতার ভিতর আছে এবং এই সকল সত্য বর্ত্তমান ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া প্রচার করাই গীতা-আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—মানুষ বুদ্ধির চালনায় জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত সমস্যা তুলিতে পারে গীতার মধ্যে সে সকলের সমাধান

নাই বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে পথ দেখাইতে পারে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে, এরূপ যত সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের আছে সে সমুদায়ই গীতার ভিতর আছে এবং এইখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা।

যোগলব্ধ, যোগজীবনের সহায় সার্ব্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করিতে হইলে, দেশকালোপযোগী ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিতে হয় এবং প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা ও মতবাদসমূহেরও সাহায্য লইতে হয়। তবে কোন বিশেষ দেশ বা কালের বাহিরে প্রযুজ্য নহে, গীতাতে এমন কথা খুব কম আছে এবং গীতার ভাব এরূপ উদার ও গভীর যে এইগুলি সহজেই সর্ব্বযুগ সর্ব্বদেশের করিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। গীতায় যে সকল দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে সেগুলিকেও আমাদিগকে এই ভাবেই লইতে হইবে। গীতা যেখানে যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করিয়াছে সেখানে পুরাকালে প্রচলিত সমগ্র যোগ-দর্শন বা সাংখ্যদর্শনের কথা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৈদান্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সার বস্তু যতটা পাওয়া গিয়াছে, গীতায় তাহাই লওয়া হইয়াছে। গীতা সাংখ্য ও যোগকে একই বৈদান্তিক সত্যে পৌঁছিবার দুইটী পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে—জ্ঞানের পথই সাংখ্য, কর্ম্মের পথই যোগ।

টীকাকারেরা গীতাকে কোন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল মতের লোকই যে নিজেদের মত সমর্থন করিতে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করিবার

জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালপ্রচলিত সমস্ত মতবাদের উদার সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যায় এবং এই সমন্বয়ের সাহায্যে গীতা যে চিরন্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে—তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তি তর্ক নহে। গীতাপ্রদর্শিত পথে যাহারা অগ্রসর হইবেন তাহারাই ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আরও অগ্রসর হইতে পারিবেন।

গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধারা, গীতার ভাব প্রকাশের রীতি পদ্ধতি এরূপ যে কোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা সীমাবদ্ধ নহে, কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করে না। এক অনাদি ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি একথা গীতা স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদ গীতার মত নহে এবং যদিও গীতা ত্রিগুণময়ী মায়ার কথা বলিয়াছে তথাপি গীতা মায়াবাদী নহে; যদিও গীতার মত এই যে সেই এক ব্রহ্মের পরা প্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং ব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ার উপরে জোর না দিয়া তাহাতে বাস করার কথাই গীতা বিশেষভাবে বলিয়াছে, তথাপি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গীতার মত নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইতেই যে সংসার হইয়াছে একথা স্বীকার করিলেও গীতা সাংখ্য নহে; পুরাণে যাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে সেই কৃষ্ণকেই গীতা পূর্ণ ভগবান বলিয়াছে এবং অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে ভিন্ন বা কোন অংশে ছোট বলে নাই—তথাপি গীতা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ নহে। দার্শনিক মতবাদের তর্কযুদ্ধে কোন পক্ষের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে।

ভারতের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ সমন্বয় অন্য সময়েও হইয়াছে; প্রাচীন ঋষিগণের আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে বাহ্যজগতের অন্তরালে যে দেবজগতের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহাই তৎকালোচিত ভাব ও ভাষায় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ এবং তাহাদের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্যের সমাধান করিয়া উপনিষদ্ বৃহত্তর সমন্বয় সৃষ্টি করিল। এই অপূর্ব্ব রত্নের আকর উপনিষদ্‌সমূহকে মন্থন করিয়া বিচার যুক্তির সাহায্যে গীতা পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। তন্ত্র আবার আধ্যাত্মিক জীবনের বাধাসমূহকে ধরিয়া সেইগুলিকে পূর্ণতর জীবনের সহায়রূপে ব্যবহার করিবার পথ দেখাইয়াছে—সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলা স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সন্ধান দিয়াছে। মানুষ যে পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে পারে বৈদিক ঋষিরা তাহা জানিতেন, তন্ত্র আবার এই সত্য ধরিয়াছে এবং অতঃপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনে এই সত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে।

যে যুগে মানুষ পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে এখনই তাহার সূচনা হইয়াছে। বেদ বা উপনিষদ্, গীতা বা তন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আমাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হইবে না। কত নূতন স্রোত আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মহান ধর্ম্মনীতিগুলি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের অনুসন্ধিৎসার ফলে যে সকল শক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে সে গুলিও আমরা অবহেলা করিতে পারি না; পুরাতন, অতি পুরাতন যুগের কত গুপ্ত রহস্য, নূতন আলোক আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আবার আমরা আর এক মহান্—অতি মহান্ সমন্বয়ের

সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্তু, পূর্ব্বপূর্ব্ব কালে যেমন শেষের সমন্বয়কে ভিত্তি করিয়াই নূতন বৃহত্তর সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছে—এবারেও সেইরূপ আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিত্তি করিতে হইবে —গীতা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

অতএব, পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার নিমিত্ত আমরা গীতা পাঠ করিতে চাহি না। গীতার মধ্যে যে সার্ব্বজনীন চিরন্তন সার সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে পারে, পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে—তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতা পাঠের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান গুরু

জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তক হইতে গীতার বিশেষ তফাৎ এই যে গীতা বেদ, উপনিষদ্, কোরাণ বা বাইবেলের মত নিজেই একটি স্বতন্ত্র পুস্তক নহে—ইহা একটি জাতির জীবন ও যুদ্ধের ইতিহাস মহাকাব্য মহাভারতের অংশ। তৎকালীন এক মুখ্য ব্যক্তি তাহার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মের সম্মুখীন হইয়াছে, সে কর্ম্ম অতি ভীষণ, তাহাতে বিষম অনর্থ ও রক্তপাতের সম্ভাবনা, এমন সময় উপস্থিত যে—হয় তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে নতুবা অচল অটল ভাবে সেই কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে—এই সন্ধিক্ষণে গীতার উৎপত্তি।

কেহ কেহ বলেন গীতা স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াই প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই মতের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু, যদিও একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গ্রন্থকার অতি যত্নের সহিত গীতাকে মহাভারতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন এবং যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। "তুমি যুদ্ধ কর" একথা শুধু যে গীতায় প্রথমে বা শেষে আছে তাহা নহে—যখন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে, তাহার মধ্যেও গ্রন্থকার অনেক সময় স্পষ্টভাবেই এই কথার উল্লেখ

করিয়াছেন। অতএব, গীতা বুঝিতে হইলে এই যে ঘটনা গুরু ও শিষ্য উভয়ে সকল সময়েই মনে রাখিয়াছিলেন—তাহার হিসাব আমাদিগকে করিতেই হইবে। (গীতায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহ সাধারণ ভাবে আলোচিত হয় নাই, জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে ঐ সকল তত্ত্বের প্রয়োগ করা হইয়াছে) সেই সমস্যা কি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অর্থ কি, অর্জ্জুনের আভ্যন্তরিক জীবনের উপরেই বা ইহার প্রভাব কি—তাহা বুঝিতে না পারিলে গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে।

জীবনের কোন সামান্য ব্যাপার লইয়া যে সকল প্রশ্ন বা সংশয় উঠে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ ধারণার দ্বারাই সে সকলের সমাধান হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধারণ ঘটনা প্রসঙ্গে জীবনের গূঢ় রহস্য সম্যক আলোচনা করা যায় না। বহুমুখী গভীরতম জ্ঞানের প্রচার করিতে হইলে এরূপ অসাধারণ ঘটনা প্রয়োজন, যে প্রসঙ্গে কঠিন প্রশ্ন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জটীল সমস্যাসমূহ আপনিই উঠিতে পারে। গীতার গুরু এবং শিষ্য এবং যে অবস্থায় গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এই তিনটিরই বিশেষ নিগূঢ় অর্থ আছে। মানবের জীবন ও আধ্যাত্মিকতার গূঢ় সমস্যাসমূহ এই তিনটির সাহায্যে কতকটা রূপকচ্ছলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানই গীতার গুরু। ভগবান তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন এবং অলক্ষ্যে চালনা করিতেছেন—সেই কর্ম্মের নায়ক এবং সেই যুগের মুখ্য ব্যক্তি অর্জ্জুন হইতেছেন গীতার শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুনের মনের ভিতর যখন তোলপাড় উপস্থিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার অভ্যস্ত ধারণাসমূহ ধাক্কা খাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, জগৎ কি, ঈশ্বর কি, মানবের জীবনের, মানবের কর্ম্মের অর্থ কি,

উদ্দেশ্য কি—এই সমস্ত প্রশ্ন যখন স্বতঃই উঠিয়াছে সেই সন্ধিক্ষণ অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে।

ভগবানের অবতার সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে এ বিশ্বাস কখনই তেমন দৃঢ় হয় নাই, কারণ সেখানে লোকে অবতারের কথা শুধু ধর্ম্মগ্রন্থেই পড়িয়াছে, যুক্তির দ্বারা বা জীবনে তাহারা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করে নাই। ভারত-বাসীর জীবনের উপর বেদান্তপ্রচারিত সত্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং সেই সত্যের সহিত অবতার-বাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকায় ইহা সহজেই ভারতবাসীর বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সৎবস্তু এবং তাহার মূর্ত্তি বা অংশ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে, ভগবানের প্রকাশেরও ক্রম আছে। ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, পরব্রহ্ম। সাধারণ জীবে ভগবানের অংশ মায়ার আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধ জীব তাহার দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থানে স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তির আবির্ভাব—সেগুলি বিভূতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু, যখন সেই অজ অব্যয়াত্মা ভূতগণের ঈশ্বর জগতের কল্যানের নিমিত্ত নিজ মায়াকে বশীভূত করিয়া (সাধারণ জীবের মত মায়ায় বশীভূত হইয়া নহে) মায়িক দেহ গ্রহণ করেন—মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হন—সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও মানবোচিত শরীর মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন—তখনই তাহাকে অবতার বলা হয়।

মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। মানুষ যেদিন তাহা সম্যকরূপ উপলব্ধি করে—সেই দিন হইতেই সে ভগবানের মধ্যে বাস করে। বেদান্তবাদীদের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব তাঁহারা নর-নারায়ণের রূপক

অবলম্বন করিয়া এই তত্বটি বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। (নর নারায়ণের চির সাথী। নর অর্থাৎ জীবাত্মা যেদিন বুঝিতে পারে যে সে নারায়ণ অর্থাৎ পরমাত্মার সখা তখনই সে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতেই সে ভগবানের নিকট বাস করে—"নিবসিষ্যসি ময্যেব।") সখারূপে ভগবান সকল সময়েই আমাদের কাছে কাছে রহিয়াছেন—আমাদের হৃদয়-রথে সর্ব্বদাই তিনি সারথিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে চালাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

—তিনি যে আমাদের কত আপনার, কত নিকট বন্ধু, আমাদের হাত ধরিয়া কেমন করিরা তিনি আমাদিগকে চালাইতেছেন—তাহা আমরা বুঝি না। যেদিন এই মায়ার আবরণ, এই অজ্ঞানের অন্ধকার টুটিয়া যায়, মানুষ হৃদিস্থিত হৃষিকেশের সম্মুখীন হয়, তাহার বাণী শুনিয়া প্রমাদ ঘুচায়, তাহার শক্তিতে কর্ম্ম করে—তখনই সে তাহার মনবুদ্ধি ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে এবং ভগবানের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হয় এবং ইহাকেই গীতা "উত্তম রহস্য" বলিয়াছেন। মানুষের মধ্যে হৃষিকেশ অন্তর্য্যামীরূপে চিরদিনের জন্যই অবতার—এই অন্তর্য্যামী ভগবান যখন মানব শরীর, মানব মন বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন, পথ দেখান, চালিত করেন তখন তিনি বাহ্যজগতে অবতাররূপে প্রকট হন।

অতএব অবতারবাদের দুইটী দিক আছে। সকল মানবের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন—যদি আমরা এই অন্তর্য্যামী ভগবানকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে ভগবান বাস্তবিকই স্বয়ং মানব শরীর গ্রহণ করেন, একথা না মানিলেও গীতার অর্থ বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা

ভগবানকে গীতা যে ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে এবং মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার যে শক্তি তাহার আছে—শুধু সেইটি বুঝিলেই চলিবে। গীতা অবতার স্বীকার করে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—বহুবার তাঁহার জন্ম হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্ম মরণ না থাকিলেও তিনি অঘটন ঘটন পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাস যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হন। এই অনাদ্যা মায়া তাহার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত উহা তাহাতে থাকিয়া জগতের কর্য্য সম্পাদন করে। কার্য্য শেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম তাঁহার জন্ম মরণ। কিন্তু এই অবতারত্বের উপর গীতার ঝোঁক নাই। যাহা হইতে সর্ব্বভূতের আবির্ভাব, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, মনুষ্যের গোপন হৃদয়বিহারী সেই অতিন্দ্রীয়, অন্তর্য্যামী ভগবানই গীতা প্রচারিত শিক্ষার কেন্দ্র। এই অন্তর্য্যামী ভগবানকে নির্দ্দেশ করিয়াই গীতার সপ্তদশ অধ্যায়, ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"অত্যুগ্র আসুরিক তপস্যাকারীরা দেহমধ্যস্থিত আমাকে কৃশীকৃত করে।" এই অন্তর্য্যামিকে লক্ষ্য করিয়াই ষোড়শ অধ্যায় অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।" দশম অধ্যায় একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে "আমি তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার তত্বজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি"—এখানে সেই মানুষের অন্তঃকরণে স্থিত ভগবানেরই কথা বলা হইয়াছে। এই চিরন্তন অবতার, মনুষ্যের ভিতরের ভগবান সর্ব্বকালে মানুষের মধ্যস্থিত এই দৈবচৈতন্য বাহ্য দৃশ্যরূপে গীতায় মানবাত্মার সহিত কথা করিয়াছেন, জীবন ও দৈবকর্ম্মের গূঢ় তত্ব বুঝাইয়া-

ছেন, সংসারের বিষম রহস্যের সম্মুখীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মানবকে ভগবদ্বাক্য, ভগবদ্‌জ্ঞানের আলোক দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন। ভগবান যে গুরু, সখা ও সহায়রূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন ভারতের ধর্ম্ম তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত কোথাও মন্দিরে ভগবানের মানবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, কোথাও অবতারের পূজা করিতেছে, কোথাও মানবগুরুর মুখ দিয়া সেই এক জগদগুরুর কথা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর অর্চ্চনা করিতেছে। এই সকল আচরণের দ্বারা চেষ্টা হইতেছে যেন আমরা সেই হৃদিস্থিত ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে পারি, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া সেই অরূপের রূপ দর্শন করিতে পারি, সেই ভগবদ্ শক্তি, ভগবদ্ প্রেম, ভগবদ্ জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, নররূপী কৃষ্ণ যে মহাভারত বর্ণিত বৃহৎ কর্ম্মের গুপ্ত কেন্দ্র, তিনি নায়ক না হইয়াও অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্তই পরিচালন করিতেছেন ইহারও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। ঐ বৃহৎ কর্ম্মে বহু লোক, বহু জাতি জড়িত। কেহ নিজে কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া একটা কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য করিতে আসিয়াছে, কৃষ্ণ এই দলের নেতা। কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করিতেছেন, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে সকল অন্যায়ের প্রবর্ত্তক এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্ম্মের ধ্বংসকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছে। ঐ কর্ম্মের সাফল্যই যাহাদের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণ তাহাদের উপদেষ্টা, সহায়, সুহৃদ। ঐ কর্ম্ম যখন স্বভাব—নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্ম্মের কর্ত্তাগণ যখন শত্রু হস্তে নির্য্যাতিত হইয়া এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ জয়ের জন্য তৈয়ারী হইতেছে—

অবতার তখন অদৃশ্য, কখনও কেবল সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য দেখা দিয়াছেন। কিন্তু, প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন—তাহাও এরূপ অলক্ষ্যে যে সকলেই আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কি তাঁহার প্রিয়তম সখা ও প্রধান যন্ত্র অর্জ্জুনও নিজেকে যন্ত্র মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং শেষে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এতকাল তিনি তাহার সখারূপী ভগবানকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার উপদেশ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এমন কি তাঁহার ভগবদ্‌প্রকৃতি না বুঝিয়াও তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। কিন্তু, তিনিও অপরের ন্যায় অহঙ্কারের বশেই চলিয়াছেন। অজ্ঞানীকে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, পরিচালন করা হয়, অজ্ঞানী তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে—অর্জ্জুনের পক্ষে তাহাই হইয়াছে। যতক্ষণ না সব আসিয়া কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারথি রূপে (তখনও যোদ্ধা রূপে নহে) ঐ যুদ্ধের নায়কের রথে না নামিলেন—ততক্ষণ তিনি তাঁহার প্রিয়তমদের নিকটও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই।

অতএব মানুষের সহিত ভগবান কিরূপ ব্যবহার করেন—নররূপী কৃষ্ণ যেন তাহারই রূপক, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের অহঙ্কারের ও অজ্ঞানের বশেই আমরা চলি—ভাবি বুঝি আমরাই কর্ত্তা, আমরা সকল ফলের প্রকৃত কারণ। প্রকৃতপক্ষে যাহা আমাদিগকে চালিত করে, তাহাকে আমরা একটা অস্পষ্ট, এমন কি একটা মানুষিক ও পার্থিব জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা বা শক্তির উৎস, কোন নীতি, জ্যোতিঃ বা তেজ বলিয়া মাঝে মাঝে দেখি, না জানিয়া, না বুঝিয়া পূজাও করি। শেষে এক দিন

আসে যখন এই রহস্যের সম্মুখে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

ভগবান শুধু মানুষের আভ্যন্তরীন জীবনেই নাই—সংসারের দুর্জ্ঞেয় বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র যাহা মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে অতি অল্পটুকুই অস্পষ্টভাবে বুঝিয়া প্রতিপদে সংশয়ের সহিত অগ্রসর হয়—ভগবান সমুদয়ই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ এক কর্ম্ম যখন বিষম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত তখনই গীতার শিক্ষার উৎপত্তি এবং ইহাই গীতার বিশেষত্ব। গীতা যে কর্ম্মবাদ প্রচার করিয়াছে—এইরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপটী দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু গীতাতে নহে, মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, শুধু গীতাতেই তিনি কর্ম্মের গূঢ় রহস্য এবং আমাদের কর্ম্মের অন্তরালে যে ভগবদ্ শক্তি রহিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে ও অন্যান্য স্থানেও অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাহচর্য্য অন্যান্য রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও ইন্দ্র ও কুৎস এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে চলিয়াছেন, কোথাও এক বৃক্ষের উপরে দুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও যুগলরূপী নর ও নারায়ণ জ্ঞানের জন্য এক সঙ্গে তপস্যা করিতেছেন। এই সকল স্থানে লক্ষ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ; কিন্তু গীতার অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের লক্ষ্য জ্ঞান নহে, যে কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানে পৌঁছান যায়, যে কর্ম্মের ভিতরে পরম জ্ঞানী স্বয়ং ভগবান রহিয়াছেন—সেই কর্ম্মই লক্ষ্য। অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ধ্যানের উপযোগী কোন নির্জ্জন শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু, যোদ্ধা ও সারথিরূপে রণক্ষেত্রে শস্ত্র সম্পাতের মধ্যে

উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব, যিনি গীতার গুরু, তিনি মানুষের অন্তর্যামী ভগবানরূপে শুধু জ্ঞানের জগতেই নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না—সমগ্র কর্ম্মজগতও তিনিই চালনা করেন। তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার জন্যই আমরা সকলেই জীবিত রহিয়াছি, কর্ম্ম করিতেছি, যুদ্ধ করিতেছি—সকল মানব জীবন তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের অজ্ঞাত প্রভু—তিনি সকল মানবেরই সুহৃদ।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব শিষ্য

গীতার গুরু কিরূপ তাহা দেখিলাম। তিনি চিরন্তন অবতার, মানব চৈতন্যে অবতীর্ণ ভগবান, সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত ঈশ্বর। দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও শক্তিসমূহের অন্তরালে থাকিয়া তিনি যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন তেমনই আবরণের অন্তরালে থাকিয়া তিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা, কর্ম্ম, বাসনা পরিচালিত করিতেছেন: যখন আমরা এই অন্তরাল—এই আবরণ ঘুচাইয়া আমাদের অপ্রকৃত "আমি"র পশ্চাতে প্রকৃত "আমি"র সন্ধান পাইব, আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের প্রকৃত অধীশ্বর সেই একমাত্র সত্য পুরুষের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারিব, আমাদের চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে তাঁহার পূর্ণজ্যোতিতে ডুবাইতে পারিব, আমাদের সকল ভ্রান্ত ইচ্ছা, সকল নিষ্ফল চেষ্টাকে তাঁহার বিরাট জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড ইচ্ছাশক্তির ভিতর ছাড়িয়া দিতে পারিব,—যখন তাঁহার অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের সকল আবেগের সকল বহির্মুখী বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে—তখনই আমাদের ঊর্দ্ধগতি লাভের সকল চেষ্টা সফল ও সমাপ্ত হইবে। তিনি জগৎগুরু। অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠজ্ঞানই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিচ্ছায়া এবং আংশিক বিকাশ। তাঁহারই বাণী শুনিবার জন্য আমাদের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

একদিকে মানবের হৃদয়বিহারী ভগবান যেমন গীতাজ্ঞানের গুরু, অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রধান অর্জ্জুন গীতার শিষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-

স্থলেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছে। যে সকল মানব এখনও জ্ঞান লাভ করে নাই কিন্তু হৃদিস্থিত ভগবানের সাহচর্য্যে সংসারে কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ ও সংশয়ে পীড়িত হইয়া প্রকৃত পথ ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে অর্জ্জুন তাহাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধু গীতাকে নহে, সমগ্র মহাভারতকেই মানবের আভ্যন্তরিক জীবনের রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করিবার একটা রীতি আছে। এই মতানুসারে মহাভারত ও গীতা মানবের বাহ্য জীবন ও কর্ম্ম লইয়া লিখিত নহে—আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদিগকে রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম করিতে হয় এখানে তাহাই বিস্তৃত রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের ভাষা ও সাধারণ ধরণ হইতে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সকল সময়ই টানিয়া অর্থ করিতে হয় এবং গীতার সহজ সরল দার্শনিক ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে বিকৃত করিতে হয়। বেদের ভাষা এবং কতক অংশে পুরাণের ভাষা যে রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—সেখানে অদৃশ্য জগতের বস্তু সমূহ বাহ্যমূর্ত্তি ও ঘটনার রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা সোজা কথায় লিখিত হইয়াছে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠিতে পারে তৎসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। এই স্পষ্ট সহজ ভাষাকে নিজেদের খেয়াল মত টানিয়া রূপক বাহির করিলে চলিবে না। তবে যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেটি আদর্শ অবস্থা। বাস্তবিক এরূপ একটা আদর্শ অবস্থা না ধরিলে তাহার সহিত গীতার শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, একটি বৃহৎ যুদ্ধের, জাতির জীবনে ভগবান কর্ত্তৃক চালিত এক বৃহৎ ব্যাপারের অর্জ্জুন প্রধান কর্ম্মী। কর্ম্মের পথে মানুষ এমন ভীষণ সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হয় যখন বিশ্ব সমস্যা,

সুখ দুঃখ সমস্যা, পাপ পুণ্য সমস্যা লইয়া তাহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গীতার শিষ্য অর্জ্জুন এরূপ অবস্থায় পতিত মানবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যে রথে ভগবান কৃষ্ণ সারথি, অর্জ্জুন সেই রথের যোদ্ধা। মানব এবং দেবতা এক রথে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে যাইবার নিমিত্ত মহাযুদ্ধ করিতেছে—এরূপ ছবি বেদেও চিত্রিত হইয়াছে কিন্তু, সেখানে ইহা নিছক রূপক। আলোক ও অমরত্বের দেশ স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্রই দেবতা। মানব যখন উচ্চ জীবনের পরিপন্থী, মিথ্যা, অন্ধকার, সঙ্কীর্ণতা, মৃত্যু প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করে তখন মানবের সাহায্যের নিমিত্ত সেই দিব্য জ্ঞানের মূর্ত্তি ইন্দ্র নামিয়া আসেন। ইন্দ্র যেখানকার অধীশ্বর সেই পরম জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, অমরত্বের রাজ্য স্বর্গই গন্তব্য স্থান। কুৎস মানব। কুৎস নামের অর্থ এই যে, সে সর্ব্বদা প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে। অর্জ্জুন অর্থাৎ শ্বেত পুরুষ তাঁহার পিতা, শ্বিত্রা অর্থাৎ শ্বেত জননী তাহার মাতা। অর্থাৎ সে সাত্ত্বিক, পবিত্র, জ্ঞানময় আত্মা—দৈবজ্ঞানের অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। যাত্রাশেষে রথ যখন গন্তব্য স্থান ইন্দ্রের রাজত্বে উপস্থিত হইল, তখন মানব কুৎস তাহার দেব সঙ্গীর এরূপ সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে যে ইন্দ্রের স্ত্রী সত্যজ্ঞানী শচী ভিন্ন আর কেহ উভয়ের মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারিল না। এই গল্পটি যে মানুষের আভ্যন্তরিক জীবনের রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। জ্ঞানের আলোক যত বর্দ্ধিত হয় ততই যে মানব দেবতার সাদৃশ্য লাভ করে তাহাই এখানে রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার সূচনা কর্ম্ম হইতেই এবং অর্জ্জুন জ্ঞানের লোক নহেন, কর্ম্মের লোক। তিনি মোটেই দ্রষ্টা বা জ্ঞানপিপাসু নহেন, তিনি যোদ্ধা।

শিষ্যের চরিত্রের এই বিশেষত্ব গীতার প্রথমেই পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং বরাবর এই বৈশিষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থানে সমবেত জ্ঞাতিগণকে দেখিয়া অর্জ্জুনের যে ভাব, যে বিকারের উদয় হয়, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে অর্জ্জুনের প্রকৃতি জ্ঞানীর নহে, কর্ম্মীর। যে সকল ভাবপ্রবণ চরিত্রবান বুদ্ধিমান মনুষ্য সংসারের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে—কিন্তু, উচ্চ আদর্শ মানিয়া লইয়া সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়া সকল পতন অভ্যুত্থানের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়া যায়—অর্জ্জুনের প্রকৃতি তাহাদেরই মত।—এই সকল লোকের ধ্যান ধারণা আঘাত পাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া যায়, এতদিন তাহারা যে বিধি নিষেধ, যে আদর্শ মানিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছিল তাহাতে যখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন কর্ম্মজীবনের সকল অবলম্বন হারাইয়া তাহারা যেমন বিমূঢ় হইয়া পড়ে অর্জ্জুনের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

গীতার ভাষায় অর্জ্জুন ত্রিগুণের অধীন। সাধারণ মনুষ্যের মত এই ক্ষেত্রেই তিনি এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন। অর্জ্জুন শুধু এতদূর পবিত্র ও সাত্ত্বিক যে জীবনে তিনি উচ্চ আদর্শ, উচ্চনীতির বশে চলিয়াছেন এবং উচ্চ ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যতদূর তদনুসারে তিনি তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছেন—এবং শুধু এইখানেই তাঁহার অর্জ্জুন নামের সার্থকতা। তিনি উগ্র অসুর প্রকৃতির লোক নহেন, রিপুর বশ নহেন। শান্ত, সংযত এবং অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে তিনি অভ্যস্ত। অন্যান্য মানবের মত তাঁহারও অহং জ্ঞান আছে—তবে তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার। ইহার বশে তিনি নিজের স্বার্থ বা বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য বিশেষ ব্যগ্র

না হইয়া—অপরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়াছেন—সামাজিক এবং নৈতিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন, নিজের. কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক যে সকল আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বলা হয়। মানবের ধর্ম্ম কি, বিশেষতঃ উচ্চহৃদয় আত্মজয়ী, জননায়ক, যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয় বীরের ধর্ম্ম কি—অর্জ্জুনের প্রধান চিন্তা তাহাই এবং জীবনে তিনি সেই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে যাহা ঠিক যাহা সৎ তিনি এতদিন তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, এই নীতি আজ তাহাকে এক ভীষণ অঘটিতপূর্ব্ব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে—যে যুদ্ধের ফলে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্য সমাজ ধ্বংস হইবে, ভারতের ক্ষত্রিয় বংশের যাহারা গৌরব তাহারা বিনষ্ট হইবে, অর্জ্জুনকে সেই সর্ব্বনাশকর যুদ্ধের নায়ক হইতে হইয়াছে।

অর্জ্জুন যে কর্ম্মী তাহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপার তাহার চক্ষুর গোচর হইল, ততক্ষণ তিনি কি গুরুতর কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি হইল না। তিনি যখন তাহার সখা ও সারথিকে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথস্থাপন করিতে বলিলেন তখন তাহার অন্য কোন গভীর মৎলব ছিল না। তিনি গর্ব্বের ভরে দেখিতে চাহিলেন যে অধর্ম্মের পক্ষে কত সহস্র লোক যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে হেলায় পরাজয় করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহারা জ্ঞানীর প্রকৃতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল—তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই চিন্তার দ্বারা সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিত। কিন্তু, কর্ম্মবীর অর্জ্জুন যখন চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, তখনই সেই ভীষণ গৃহবিবাদের প্রকৃত মর্ম্ম প্রথম তাহার উপলব্ধি হইল। তিনি দেখিলেন—সে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু একই দেশের, একই জাতির, লোক সমবেত হয় নাই, একই কুলের একই পরিবারের লোকই পরস্পরকে যুদ্ধে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সামাজিক মনুষ্যের নিকট যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, শত্রুভাবে তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর—সব ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তির সম্বন্ধ অসির আঘাতে ছিন্ন করিতে হইবে। অর্জ্জুন যে পূর্ব্বে ইহা জানিতেন না, তাহা নহে—তবে, তিনি এতটা গুরুত্ব যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহার দাবীর ন্যায্যত্ব, ন্যায়ের রক্ষা, অন্যায়ের দমন, দুষ্টের শাসকরূপে তাঁহার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ধর্ম্মপক্ষ সমর্থনরূপ তাহার জীবনের নীতি—এই সকলের চিন্তায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে এই যুদ্ধের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই, হৃদয়ে অনুভব করেন নাই, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন নাই। এখন সারথিরূপী ভগবান কর্ত্তৃক সেই দৃশ্য যখন তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরা হইল—তখন একটা মর্ম্মান্তিক আঘাতের মত সমস্ত ব্যাপারটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল।

সেই আঘাতের প্রথম ফল হইল অর্জ্জুনের প্রবল শারীরিক ও মানসিক বিকার। এই বিকারের ফলে যুদ্ধের উপর, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঐহিক লাভের উপর, এমন কি জীবনেরও উপর অর্জ্জুনের বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ভোগসুখই সাধারণ (অহঙ্কৃত) মানবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য—অর্জ্জুন তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রিয় রাজ্য, প্রভুত্ব, জয়—অর্জ্জুন

তাহাও বর্জ্জন করিলেন। এই যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধ বলা যাইতেছে, কার্য্যতঃ ইহা কি স্বার্থের জন্যই যুদ্ধ নহে? তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য, তাঁহার ভ্রাতাগণের, তাঁহার দলের লোকের স্বার্থের জন্য, রাজ্যভোগ, আধিপত্যের জন্যই এই যুদ্ধ নহে কি? কিন্তু এই সকল বস্তুর জন্য এত অধিক মূল্য দেওয়া চলে না। কারণ সমাজ ও জাতিকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই সব বস্তুর প্রয়োজন—ইহাদের অন্য প্রয়োজনীয়তা আর কিছুই নাই—অথচ, যুদ্ধে জ্ঞাতি ও কুল ধ্বংস করিয়া তিনি সেই সমাজ ও জাতিকেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তাহার পর হৃদয়বৃত্তির কান্না আরম্ভ হইল। যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয় সেই "স্বজনই" যুদ্ধার্থ উপস্থিত। পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও এই সকল আপনার লোককে বধ করিতে কে চায়? তাহার পর বিবেক জাগিয়া উঠিয়া যোগ দিয়া বলিল—এই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মহাপাপ! পরস্পরকে হত্যা করা পাপ—ইহাতে ন্যায়, ধর্ম্ম কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে, তাহারা সকলে স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র। তাহাদিগকে ছাড়িলে জীবনেই কোন সুখ থাকে না। হৃদয়ের পবিত্র বৃত্তিগুলিকে দলিত করিয়া তাহাদিগকে বধ করা কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না—ইহা অতি ঘৃণ্য, জঘন্য পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর পক্ষই দোষ করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে, প্রথম পাপ তাহারাই করিয়াছে—তাহাদের লোভ ও স্বার্থপরতাই এই গৃহযুদ্ধ ঘটাইয়াছে—ইহা সত্য বটে। তথাপি এরূপ অবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই পাপ—এরূপ করিলে তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পাপ করা হইবে। কারণ, তাহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ উপলব্ধি করিতেছে না—কিন্তু

পাণ্ডবগণ স্পষ্ট জানিয়া বুঝিয়াই সেই মহাপাপ করিবে! কিসের জন্য? কুলের ধর্ম্ম. সমাজের ধর্ম্ম, জাতির ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য? ঠিক এই সকল ধর্ম্মই—ভ্রাতৃবিরোধের ফলে বিনষ্ট হইবে। কুল ধ্বংসোন্মুখ হইবে, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবেশ করিবে, কুলের পবিত্রতা নষ্ট হইবে—সনাতন জাতিধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন যাইবে। এই নৃশংস গৃহ বিবাদের ফল শুধু এই হইবে যে জাতি নষ্ট হইবে, জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এবং এই মহাপাপের কর্ত্তাগণকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব অর্জ্জুন এই ভীষণ যুদ্ধের জন্য দেবতাগণ তাঁহাকে যে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ দিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারের অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাও ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল। আমি যুদ্ধ করিব না।"

অতএব অর্জ্জুনের ভিতর যে ভাবসঙ্কট উপস্থিত তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুরূপ নহে। অর্জ্জুন সংসারকে অসার বা মিথ্যা বুঝিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাহার মন ও বুদ্ধিকে বাহ্যজগৎ ও কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী করেন নাই। জগতের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি প্রকৃত সমাধানের নিমিত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়েন নাই। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের প্রচলিত মানদণ্ডগুলি মানিয়া লইয়া তিনি এতদিন নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এইগুলি শেষকালে তাঁহাকে এমন এক সঙ্কটস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে, যেখানে তাহার ধ্যানধারণা ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান ভীষণ ভাবে গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তাহার জানা বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। "ধর্ম্ম" শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহা বস্তু সকলকে ধরিয়া রাখে এবং যাহাকে, যে

নীতিকে ধরিয়া মানুষ কর্ম্মের পথে, সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অর্জ্জুনের সঙ্কট এই যে, এতদিন যে সকল ধর্ম্ম, যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে সংসারে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন—এখন সেগুলিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছেনা, সব যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তাই তাহার দেহ মন চিত্ত বিবেক এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মীর জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় সঙ্কট আর কিছুই নাই। এমনই করিয়া তাহার পরাজয় হয়। অর্জ্জুনের মধ্যে এই বিদ্রোহ খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। আত্মীয়-বধের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া কৃপার বশে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল, মানুষ সংসারে সচরাচর ধন, মান, প্রতিপত্তি যাহা কিছু চায় তাহারই উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। যাহাতে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা পদদলিত করিতে হইবে সেই কঠোর কর্ত্তব্য করিতে তাহার প্রাণ চাহিল না। আত্মীয় ও গুরু বধ করিয়া রুধিরাক্ত ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করা যে পাপ সেই পাপভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্দেশ্যের জন্য এই নৃশংস যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে —এই ব্যর্থতার আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার সর্ব্বতোমুখী আন্তরিক অবসন্নতা সংক্ষেপে তখনই প্রকাশ করিলেন, যখন তিনি বলিলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।

—"দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—তিনি ধর্ম্ম কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহার কর্ম্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন নীতির অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন—তাহা স্থির করিতে

পারিতেছেন না। শুধু এই জন্যই তিনি শিষ্য ভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কার্য্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন—"কর্ম্মের একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও—আমি ইহাই হারাইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দেও যেন আমি নিশ্চিন্তমনে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।" জীবনের গূঢ় রহস্য,—সংসারের গূঢ় রহস্য এই সকলের প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন না—তিনি কেবল চাহিলেন একটা "ধর্ম্ম"।

অথচ এই যে রহস্য অর্জ্জুন জানিতে চাহেন না, ভগবান অর্জ্জুনকে ঠিক সেইটিই জানাইতে চাহেন। অন্ততঃ উচ্চজীবন লাভের জন্য যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে সেই জ্ঞানটুকু দেওয়াই ভগবানের উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি চান যে অর্জ্জুন সকল "ধর্ম্ম" পরিত্যাগ করিয়া—সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করা এবং সেই জ্ঞানের বশে কাজ করা—এই একমাত্র বিরাট ও উদার নীতি গ্রহণ করুক। অতএব, প্রথমে তিনি পরীক্ষা করিয়া লইলেন যে মানুষ সচরাচর যে সকল কর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যে সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে, অর্জ্জুন সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কি না। তাহার পর তিনি আত্মার অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন সব কথা বিশদভাবে বলিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কর্ম্মের বাহ্যিক আইনকানুনের কোন কথাই বলিলেন না। তাহাকে আত্মার সমত্ব লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, ফল কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে, বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও স্থিরা রাখিতে হইবে, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম ও জীবনযাপন করিতে হইবে। অর্জ্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি জানিতে চাহিলেন যে এরূপ

অবস্থান্তর হইলে মানুষের বাহ্যিক কর্ম্মে কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার কর্ম্ম, তাহার চালচলনের উপর এরূপ পরিবর্ত্তনের কি প্রভাব হইবে? কৃষ্ণ কিন্তু কর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কর্ম্মের পশ্চাতে আত্মার অবস্থা (Soul state) কিরূপ থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন শুধু বিস্তার করিয়া তাহাই বলিতে লাগিলেন। শুধু বুদ্ধিকে বাসনাশূন্য সমত্বের অবস্থায় স্থিরভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চলিবে। অর্জ্জুন চাহিয়াছিলেন কর্ম্মের একটা নিয়ম কিন্তু কৃষ্ণের কথায় তাহাত কিছু পাইলেন না বরং তাহার মনে হইল কৃষ্ণ যেন কর্ম্ম নিষেধই করিতেছেন। তাই তিনি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"যদি তোমার অভিমত এই যে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তবে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম্ম প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ; এই দুইটীর যেটি ভাল তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি।" অর্জ্জুনের এই কথায় কর্ম্মীর প্রকৃতিই প্রকাশ পাইতেছে। সংসারে কর্ম্ম করিবার অথবা প্রয়োজন মত প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার একটা নিয়ম বা ধর্ম্ম যদি শিখিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মীর নিকট শুধু আধ্যাত্মিক আলোচনা বা আভ্যন্তরীন জীবনের কথার কোন মূল্য নাই। কিন্তু সংসারে থাকিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ সংসারের উপরে উঠিতে হইবে এরূপ বাক্য বিমিশ্র এবং এরূপ গোলমেলে কথা শুনিবার ও বুঝিবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই।

অর্জ্জুনের বাকী যত প্রশ্ন সব তাঁহার এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহার কর্ম্মীর স্বভাব হইতেই উঠিয়াছে। যখন তাঁহাকে বলা হইল যে আত্মার সমত্ব হইলে কর্ম্মের বাহ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না—সকল

সমস্ত নিজ প্রকৃতি অনুসারেই তাঁহার কর্ম্ম করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরের ধর্ম্মের তুলনায় নিজের ধর্ম্ম সদোষ হইলেও আপন ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করাই উত্তম—এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে? কিন্তু, তাহা হইলে এই যুদ্ধ করিতে তাঁহার মনে যে পাপের আশঙ্কা হইতেছে, তাহার কি? মানুষের এই প্রকৃতিই কি তাহাকে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করিয়া পাপাচরণ করায় না? কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে তিনিই পুরাকালে বিবস্বানকে এই যোগ বলিয়াছিলেন তাহা কালে নষ্ট হয়, সেই জ্ঞান তিনি এখন অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—এই কথা বুঝা অর্জ্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কুলাইল না। এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অর্জ্জুন ভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে সেই "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি সুপরিচিত বাক্যটি বাহির করিলেন। কৃষ্ণ যখন কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য করিতে লাগিলেন অর্জ্জুন তখনও আবার "গোলমেলে" কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও।" অর্জ্জুনকে যে যোগ অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন—মানসিক সঙ্কল্প, অনুরাগ ও বাসনার বশে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত কর্ম্মী-প্রকৃতি অর্জ্জুন সেই আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে মন্দবৈরাগ্য বশতঃ অকৃতকার্য্য হয় তাহার কি গতি হয়?

কচ্চিন্নোভয় বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ় ব্রহ্মণঃ পথি ॥৬।৩৮

—সে এই সংসারের কর্ম্মের, চিন্তার, প্রেমের জীবন হারায়, দেব-

জীবনও লাভ করিতে পারে না, সুতরাং উভয় বিভ্রষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি ?

যখন অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর হইল, তিনি জানিলেন যে ভগবানকেই তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তখন তিনি স্পষ্ট জানিতে চাহিলেন যে সকল কার্য্যের মূল, সকল কর্ম্মের মানদণ্ড এই ভগবানকে তিনি কার্য্যতঃ জানিবেন, বুঝিবেন কেমন করিয়া ? সংসারে সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে কোথায় ভগবানের অভিব্যক্তি তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ? ভগবান যে দিব্য বিভূতি দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দিব্য বিভূতি সকল কি এবং সর্ব্বদা কিরূপ বিভূতিভেদ দ্বারা চিন্তা করিলে ভগবানকে জানিতে পারা যাইবে ? যিনি মানবোচিত শরীর ও মনের আড়ালে থাকিয়া অর্জ্জুনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তাঁহার ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ কি অর্জ্জুন এখনই একবার দেখিতে পান না ? অর্জ্জুনের শেষ প্রশ্নগুলিও কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া জানিবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসিত। কর্ম্মত্যাগ করিতে না বলিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে—এই কর্ম্মসন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদটা অর্জ্জুন স্পষ্ট ভাবে জানিতে চাহিলেন। বাসনারহিত হইয়া ভগবদেচ্ছার প্রেরণার বশে কর্ম্ম করিতে হইলে—পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদের প্রকৃত প্রভেদটা জানা একান্ত আবশ্যক তাই অর্জ্জুন এইগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলেন ; অর্জ্জুনকে যে ত্রিগুণের অতীত হইতে হইবে, সেই তিন গুণের ক্রিয়া কিরূপ তিনি সর্ব্বশেষে তাহাও বিশদভাবে জানিতে চাহিলেন।

এইরূপ একজন শিষ্যকে গীতার গুরু ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন ; অহংভাবের বশে কাজ করিতে করিতে শিষ্য যখন তাঁহার চরিত্র বিকাশের

এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যখন সাধারণ সামাজিক মানবের অবলম্বন নীতি সমূহ সহসা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং যখন এই নিম্নস্তরের অবস্থা হইতে তাহাকে উচ্চজ্ঞান, উচ্চজীবনের মধ্যে টানিয়া তুলিতে হইবে—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গুরু শিষ্যকে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে শিষ্য স্বয়ং যাহা চাহিয়াছেন তাঁহাও দিতে হইবে অর্থাৎ এমন একটা কর্ম্মের নিয়ম দিতে হইবে, যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের মত ভ্রমপ্রমাদ বিরোধপূর্ণ হইবে না—সে নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে আত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে অথচ ঐশ্বরীয় জীবনের বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে কর্ম্ম করিতে, জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, জগতের যুগ পরিবর্ত্তন সুসম্পন্ন করিতে হইবে, মানবাত্মা যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আসিয়াছে অজ্ঞানের বশে তাহা না করিয়া যাহাতে পশ্চাৎপদ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গীতার শিক্ষা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিনটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গীতার মূলশিক্ষা।

গীতার গুরু এবং শিষ্যের পরিচয় পাইলাম—এক্ষণে গীতাশিক্ষার মূল কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা প্রয়োজন। গীতার শিক্ষা নানা তথ্য-পূর্ণ ও বহুমুখী। গীতায় আধ্যাত্মিক জীবনের নানা ভাবের সমন্বয় করা হইয়াছে। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ মতাবলম্বীদের একদেশদর্শিতার ফলে গীতার অর্থ অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাপেক্ষাও সহজে বিকৃত করিয়া কোন বিশেষ দার্শনিক মত বা দলের পোষণ করা যাইতে পারে। অতএব; গীতার মূল শিক্ষা কি, প্রধান কথা কি, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। আমরা যে মত, নীতি বা ধারণার পক্ষপাতী তাহা অলক্ষ্যে; আমাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সর্ব্বত্রই আমরা সেই মত বা নীতির পরিপোষক অর্থের সন্ধান করি ; ফলে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ের আমরা প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধি বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না—ফলে সত্যটি হারাইয়া ফেলে। বিশেষ সাবধানী ব্যক্তিও এরূপ ভুল এড়াইতে পারেন না—কারণ, মানুষের বুদ্ধি সকল সময়েই নিজের এ সব ভুল ধরিতে সতর্ক থাকিতে পারে না। গীতাপাঠে এরূপ ভুল সহজেই হয়। কারণ গীতার কোন অংশের উপর, গীতাশিক্ষার কোন বিশেষ দিকে, এমন কি গীতার কোন বিশিষ্ট শ্লোকের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া এবং বাকী অষ্টাদশ অধ্যায় অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সহজেই নিজেদের মত—নিজেদের দার্শনিক বা নৈতিক বাদের পোষণ করিতে পারি।

এইরূপে কেহ কেহ বলেন যে গীতা মোটেই কর্ম্মশিক্ষা দেয় না—সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ সাধনার আবশ্যক গীতা শুধু তাহাই শিক্ষা দিয়াছে। শাস্ত্রবিহিত অথবা যে কোন কার্য্য হাতের নিকট উপস্থিত হয় যেমন তেমন ভাবে সম্পাদন করাই উপায়,—সাধনা। শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য। গীতার এখান সেখান হইতে শ্লোক তুলিয়া সহজেই এই মতের সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গীতা সন্ন্যাসের যে অভিনব অর্থ দিয়াছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহা হইলে এরূপ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে গীতা পাঠ করিলে এরূপ মত সমর্থন করা সম্ভব নহে। কারণ গীতায় শেষ পর্য্যন্ত বার বার বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল, সমতার দ্বারা বাসনার ত্যাগ এবং সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ।

আবার কেহ কেহ বলেন যে ভক্তিতত্ত্বই গীতার সার কথা। গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং একব্রহ্মে শান্তিময় অবস্থানের যে সকল কথা আছে সেগুলি তাহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন না। এ কথা সত্য বটে যে গীতাতে ভক্তির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ক্ষর এবং অক্ষর হইতে পৃথক উত্তম পুরুষ—যিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি লোকত্রয় পালন করিতেছেন—এই সকল (ভক্তিমূলক) কথা গীতার অত্যাবশ্যকীয় অংশ স্বীকার করি। তথাপি গীতার মতে এই ঈশ্বর শুধু ভক্তির বস্তু নহেন—এই ঈশ্বরে সকল জ্ঞানেরও পরিসমাপ্তি, তিনি সকল যজ্ঞেরও অধীশ্বর এবং সকল কর্ম্মেরও লক্ষ্য। গীতা যেখানে যেমন প্রয়োজন কোথাও কর্ম্মের উপর, কোথাও জ্ঞানের উপর, কোথাও ভক্তির উপর জোর দিয়া তিনের

সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করিয়াছে—কোনটিকে অপর দুইটি হইতে পৃথক করিয়া উচ্চস্থান দেয় নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনে মিলিয়া যেখানে এক হইয়াছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। কিন্তু যখন হইতে লোকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী মন লইয়া গীতার আদর, গীতার অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখন হইতেই গীতাকে কর্ম্মযোগের গ্রন্থ বলিয়া ধরাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতায় যে বার বার কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া লোকে গীতার জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপেক্ষা করিতেছে এবং গীতাকে শুধু কর্ম্মবাদ, শুধু কর্ম্মের পথ দেখাইবার আলোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। গীতা যে কর্ম্মবাদের গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই তবে সে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে জ্ঞানে—ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সে কর্ম্মের মূল। নিজের বা অপরের স্বার্থের জন্য যে কর্ম্ম—সংসারের, সমাজের, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম, যে নীতি, যে আদর্শ বর্ত্তমান যুগে প্রশংসিত, গীতার কর্ম্ম, বা আদর্শ তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অথচ, গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা দেখাইতে চান যে গীতায় কর্ম্মের আধুনিক আদর্শই ধরা হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও কেবলই বলিয়া থাকেন যে ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে সংসারত্যাগ এবং সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনের দিকে যে ঝোঁক আছে গীতা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করা, এমন কি আধুনিক আদর্শানুযায়ী সমাজসেবা ও পরোপকার করাই শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু, গীতার শিক্ষা যে মোটেই এরূপ নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন গ্রন্থ গীতার আলোচনা করায় এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বুদ্ধি গীতার সম্পূর্ণভাবে

প্রাচ্য, ভারতীয় শিক্ষাকে বিকৃত ভাবেই বুঝিয়াছে। গীতা যে কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে তাহা মানবীয় নহে, তাহা ঐশ্বরিক। সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদন গীতার শিক্ষা নহে। কর্ম্মের, কর্ত্তব্যের অন্য সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করিয়া অহংভাবশূন্য হইয়া যন্ত্রস্বরূপ ভগবদেচ্ছা সম্পাদনই গীতার শিক্ষা। ঈশ্বরাশ্রিত, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অহংভাবশূন্য হইয়া জগতের হিতের জন্য এবং মানব ও জগতের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্যে যন্ত্রস্বরূপ যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন সেই কর্ম্মই গীতার আদর্শ।

এই কথাই অন্যভাবে বলা যায় যে গীতা ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্র নহে—গীতা আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থ। ইউরোপীয় মনোভাবই আধুনিক মনোভাব। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার, দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই ইউরোপীয় মনোভাব প্রথম তৈয়ারী হয়। তাহার পর মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভক্তিপ্রবণতার প্রভাবে ইউরোপীয় মন পুষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইউরোপ এই দুয়েরই প্রভাব অতিক্রম করিয়াছে, ইহাদের পরিবর্ত্তে সমাজসেবা দেশসেবা, মানবজাতির সেবাই ইউরোপে আদর্শ হইয়াছে। ইউরোপ ভগবানকে ছাড়িয়াছে—বড়জোর একবার কেবল রবিবারে ভগবানের খোঁজ পড়ে। ভগবানের পরিবর্ত্তে মানুষ হইয়াছে তাহাদের উপাস্য, মানব সমাজ হইয়াছে দৃশ্য বিগ্রহ। আধুনিক ইউরোপে নীতিপরায়ণতা কার্য্যকুশলতা, পরোপকার, সমাজ-সেবা, মানবজাতির কল্যাণসাধন ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই সকলও যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে—এইগুলি ভগবদিচ্ছারই বিকাশ নতুবা মানব সমাজে এখন ইহাদের প্রতিপত্তি কেন হইবে? যিনি ঈশ্বরীয় মানব, দেবজীবন লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্ম চৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছেন—তিনিও যে কার্য্যতঃ এই সকল আদর্শই গ্রহণ

করিবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহাই যদি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যুগধর্ম্ম হয় এবং যতদিন কোন উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে না হয়—ততদিন এই আদর্শ তাঁহারও অবলম্বনীয়। কারণ, তিনি হইতেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—অপরে কিরূপ আচরণ করিবে, তিনি নিজে আচরণ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। বাস্তবিক যে সকল আদর্শ সেই যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন সভ্যতার উপযোগী অর্জ্জুনকে তদনুসারেই জীবন যাপন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানব যেমন কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া একটা বাহ্য বিধিনিষেধ মানিয়া কার্য্য করে, সেরূপ ভাবে না করিয়া জ্ঞানের সহিত, ভিতরে যে সত্য রহিয়াছে তাহা সম্যক জানিয়াই অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু, প্রকৃত কথাটা হইতেছে এই যে বর্ত্তমান যুগে মানুষ ভগবান এবং আধ্যাত্মিকতাকে আর তাহার কর্ম্মের নিয়ামক করে না—তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে এ সকল ধারনার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অথচ ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক অবস্থা বা আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটিই গীতার সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব। বর্ত্তমান যুগের মানুষ মনুষ্যত্বের উপরে উঠিতে চায় না ; কিন্তু গীতা চায় যে আমরা ভগবানের মধ্যেই বাস করি—জগতেরই কল্যাণ করিতে হউক, তথাপি ভগবানের মধ্যে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। (আধুনিক মানুষ প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চায়—গীতা ইহাদের উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে বলে) যে ক্ষর পুরুষ সর্ব্বভূত—ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি—আজকাল মানুষ তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়। গীতা বলে ইহা ছাড়া মানুষকে অক্ষর এবং উত্তম পুরুষের মধ্যেও বাস করিতে হইবে। অথবা যদিও লোকে এই সকল তত্ত্ব এখন অস্পষ্টভাবে একটুকু আধটুকু বুঝিতে আরম্ভ

করিতেছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃত মূল্য তাহারা উপলব্ধি করে না। মানুষ ও সমাজের কাজে লাগিতে পারে এইরূপ ভাবেই এই সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা হয়। কিন্তু, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার মূল্য শুধু মানুষ ও সমাজের জন্যই নহে—এই সকল তত্ত্বের নিজস্ব মূল্য আছে। আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ দুইই রহিয়াছে কার্য্যতঃ নীচকে উচ্চের জন্য রাখিতে হইবে—তবেই উচ্চও নীচকে টানিয়া উচ্চে তুলিয়া লইবে।

অতএব আধুনিক মনোভাবের বশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গীতা নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছে জোর করিয়া এরূপ বুঝাইলে ভুলই করা হইবে। যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে—তাহা একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে এরূপ অর্থ ঠিক হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সাধারণ বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা যখন কর্ত্তব্য নির্ণীত হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল সেই অবস্থা হইতেই গীতাশিক্ষার উৎপত্তি এবং সেই জন্যই অর্জ্জুন শিষ্যরূপে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবজীবনে কিছু বিরোধ অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে—যেমন, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে, অথবা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্য বা অন্য কোন উচ্চ ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধীয় আদর্শের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে; প্রাণের ভিতর ভগবানের ডাক এরূপভাবে আসিতে পারে যে সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, পদদলিত করিয়াই বাহির হইয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধের এই অবস্থা হইয়াছিল। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে গীতা এই অবস্থায় বুদ্ধকে গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী ও পিতার প্রতি

কর্ত্তব্য পালন করিতে এবং শাক্যরাজ্য শাসন করিতে বলিয়া বুদ্ধের আন্তরিক সমস্যার মীমাংসা করিত। গীতার মতে কখনই এরূপ মীমাংসা হইতে পারে না যে রামকৃষ্ণের মত লোককে কোন পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে অথবা বিবেকানন্দর মত লোককে সংসারে বদ্ধ থাকিয়া পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার অতুল প্রতিভা লইয়া নির্ব্বিকার ভাবে আইন, ডাক্তারি বা সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। (নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্যের পালন গীতার শিক্ষা নহে। দেবজীবন অনুসরণ করা, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা, কেবলমাত্র পরাৎপরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই গীতার শিক্ষা। বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মত লোকের ঐশ্বরীয় জীবন ও কর্ম্মের সহিত গীতার এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে) এমন কি, যদিও গীতা কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে—তথাপি গীতা কর্ম্ম পরিত্যাগকে একেবারে অকরণীয় বলে নাই। বরং কর্ম্ম পরিত্যাগ যে ভাগবৎ জীবন লাভের একটা পথ তাহা স্বীকার করিয়াছে। যদি সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব না হয় এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে ভিতরে যদি তীব্র ডাক আসে—তখন আর উপায় কি? সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভগবানের ডাক সকলের উপরে—অন্য কোনরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা সে ডাক অবহেলা করা চলে না।

কিন্তু, অর্জ্জুনের যে অবস্থা তাহাতে আর একটা বিষম বাধা এই যে অর্জ্জুনকে ভগবান যে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন—সেই কর্ম্মটাকে একটা মহাপাপ বলিয়াই অর্জ্জুনের ধারণা হইয়াছে। যুদ্ধ করা তাহার কর্ত্তব্য বলিতেছেন? কিন্তু, সেই কর্ত্তব্যটা এখন তাঁহার মনে একটা মহাপাপ

বলিয়াই ধারণা হইয়াছে। এখন তাঁহাকে এই কর্ত্তব্য নিঃস্বার্থভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে করিতে বলিলে কি লাভ? তাঁহার সন্দেহের কি মীমাংসা হইবে? তিনি জানিতে চাহিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? ভীষণ রক্তপাতের দ্বারা আত্মীয় স্বজন, কুল ও দেশকে ধ্বংস করা কেমন করিয়া তাহার কর্ত্তব্য হইতে পারে? তাঁহাকে বলা হইল যে তাঁহার পক্ষই ন্যায় পক্ষ; কিন্তু এ কথা অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিল না, করিতে পারে না। কারণ তাঁহার যুক্তিই এই যে তাহার পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ হইলেও—নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডের দ্বারা জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া সেই ন্যায্য দাবী সমর্থন করা কথনই ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্জ্জুন এখন আর কি করি-বেন? তাহার কর্ম্মের ফলাফল কি হইবে, পাপ হইবে কি পুণ্য হইবে সে সব সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে শুধু সৈনিকের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে? এরূপ শিক্ষা কোন রাজতন্ত্রের শিক্ষা হইতে পারে—উকীল, রাজনৈতিক, তার্কিকেরা এইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু দার্শনিকতাপূর্ণ যে মহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সংসার ও কর্ম্মের সমস্যার আমূল সমাধান করিতে প্রবৃত্ত, সে গ্রন্থের যোগ্য শিক্ষা এরূপ হইতেই পারে না। বাস্তবিক একটি তীব্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্বন্ধে ইহাই যদি গীতার বক্তব্য হয় তাহা হইলে গীতাকে জগতের ধর্ম্মগ্রন্থের তালিকা হইতে তুলিয়া দিয়া—রাজনীতি, কুটনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকালয়ের তালিকা ভুক্ত করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এ কথা সত্য যে উপনিষদের ন্যায় গীতাও পাপ পুণ্যের উপর উঠিয়া শুভাশুভের উপর উঠিয়া, সমতালাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু, সে সমতা ব্রহ্মজ্ঞানেরই অংশ—যাহারা সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাদের পক্ষেই এরূপ সমতা লাভ সম্ভব। সাধারণ মানব-

জীবনে শুভাশুভ পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীনতা গীতার শিক্ষা নহে—কারণ সাধারণ মানব পাপপুণ্য শুভাশুভের বিচার করিয়া কার্য্য না করিলে নিরতিশয় অনর্থই হইবে। বরং গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যাহারা মন্দকারী পাপী তাহারা ভগবানকে পাইবে না। অতএব অর্জ্জুন যদি সাধারণ মানব জীবনের ধর্ম্মই ভালরূপে পালন কয়িতে চান তাহা হইলে যেটাকে তিনি পাপ, নরকের পথ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন সেটা সৈনিক হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও তাঁহার পক্ষে নিঃস্বার্থ ভাবেও সে কর্ত্তব্য পালন করা চলে না। তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার বিবেক যেটাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেছ—সহস্র কর্ত্তব্য চূরমার হইয়া যাইলেও সেটা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেই হইবে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ত্তবের (duty) * ধারণা বস্তুতঃ সামাজিক সম্বন্ধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। "কর্ত্তব্য" কথাটার প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া দিয়া ব্যাপকভাবে আমরা "নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্যের" কথা বলিতে পারি—বলিতে পারি যে গৃহত্যাগ করাই বুদ্ধের কর্ত্তব্য ছিল অথবা গুহার ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই তপস্বীর কর্ত্তব্য। কিন্তু, স্পষ্টতঃ ইহা শুধু শব্দের অর্থ লইয়া খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ত্তব্য (duty) সম্বন্ধবাচক শব্দ—অন্যের সহিত আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ

* এখানে ইংরাজী duty "কর্ত্তব্য" বলিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে—কারণ ইহাই প্রচলিত প্রথা। কিন্তু "কর্ত্তব্য" শব্দের প্রকৃত অর্থ "যাহা করিতে হইবে"—ইহা duty না হইতেও পারে। কাহারও প্রতি আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্য তাহার প্রতি আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার প্রতি শুধু সেইটিই আমার duty.

শুধু তাহার দ্বারাই তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়। পিতা হিসাবে পিতার কর্ত্তব্য সন্তানকে লালন পালন করা, শিক্ষা দেওয়া। মক্কেল দোষী জানিলেও উকীলের কর্ত্তব্য তাহার পক্ষসমর্থন করা, তাহাকে খালাস করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সৈনিকের কর্ত্তব্য হুকুম মত গুলি চালান—এমন কি তাহার স্বদেশবাসী তাহার আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করা; বিচারকের কর্ত্তব্য দোষীকে জেলে দেওয়া, হত্যাকারীকে ফাঁসী দেওয়া। যতক্ষণ লোক এই সকল পদে থাকিতে স্বীকৃত ততক্ষণ তাহাদের কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট—ততক্ষণ ধর্ম্ম বা নীতির আর কোন কথাই উঠে না। কিন্তু, যদি ভিতরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, উকীলের যদি ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া ধারণা হয় যে, যে কোন অবস্থাতেই হউক মিথ্যার সমর্থন করা ঘোরতর পাপ, বিচারকের যদি বিশ্বাস হয় যে মানুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া পাপ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিক যদি টলষ্টয়ের মত উপলব্ধি করে যে সকল অবস্থাতেই যেমন নরমাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ তেমনই মানুষকে বধ করাও নিষিদ্ধ—তখন তাহারা কি করিবে? এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াও যে পাপ হইতে নিজকে বাঁচাইতে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এরূপ অবস্থায় পাপপুণ্যের বোধ কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা কর্ত্তব্যের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না—মানুষের ভিতরে ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে সে বোধ আপনা হইতেই আইসে।

বাস্তবিক পক্ষে জগতে কর্ম্মের দুইটি বিভিন্ন নিয়ম আছে—এবং স্তর ভেদে দুইটাই ঠিক। একটি নিয়ম প্রধানতঃ আমাদের বাহ্যিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর একটি নিয়ম বাহ্যিক সম্বন্ধের কোন ধার ধারে না—তাহা সম্পূর্ণভাবে বিবেক ও ধর্ম্ম জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা আমাদিগকে এমন শিক্ষা দেয় না যে উচ্চস্তরকে নিম্ন-

স্তরের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। যখন মানুষের ভিতর ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠে তখন সামাজিক কর্ত্তব্যের সম্মুখে সেই ধর্ম্মজ্ঞান, পাপপুণ্য-বোধকে বলি দিতে হইবে গীতা এমন কথা কখনই বলে না। সাংসারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান এই দুইয়ের বিরোধ ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে,—ইহাই গীতার উপদেশ। গীতা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে ভগবানের প্রতি দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কর্ম্মের জন্য কোন বাহ্যিক আইন কানুনের বশবর্ত্তী না হইয়া অন্তরের মধ্যে ভগবদ্ প্রেরণার বশে কর্ম্মই গীতার উপদেশ—আমরা পরে দেখিব যে এই ব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম্মবন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি এবং আমাদের অন্তরস্থিত এবং উর্দ্ধস্থিত ভগবানের প্রেরণায় কর্ম্ম—ইহাই গীতাশিক্ষার সার কথা।

গীতার ন্যায় মহৎগ্রন্থ খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না—গীতায় কেমন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে কর্ত্তব্য পালনের শাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া প্রথম এই নূতন ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা গীতাকে কর্ত্তব্য পালনের গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যা-কারেরা গীতার প্রথম তিন চারিটী অধ্যায়ের উপরই সব ঝোঁকটুকু দিয়াছেন। আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ত্তব্য পালনের কথা আছে সেইখানটিকেই গীতাশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"তোমার কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—এই কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বাকী

অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহারা উপলব্ধি করেন না। তবে এরূপ ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক যুগে মানুষ দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার লইয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে চায় না। তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অর্জ্জুনের মতই এমন একটা কাজ চলা নিয়ম বা ধর্ম্ম চায় যাহাতে তাহাদের কাজ করিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা এরূপ ভাবে করিলে উন্টা বুঝা হইবে।

গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। গীতা-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহা আদেশ দিলেন—"উঠ, শত্রুগণকে বিনাশ কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।" এই আদেশে খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার বা নির্ব্বিকার বৈরাগ্যের প্রশংসা নাই। ইহা অভ্যন্তরীন সাম্য ও উদারতার অবস্থা, ইহাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তি। "যে কর্ম্ম করিতে হইবে"—এইরূপ স্বাধীনতা ও সমতার সহিতই করিতে হইবে। কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম—"যে কর্ম্ম করিতে হইবে" এই বাক্যের দ্বারা গীতায় শুধু সামাজিক বা নৈতিক কর্ম্ম বুঝায় না—গীতাতে ইহা অতিবিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সর্ব্ব-কর্ম্মানি—মানুষ যাহা কিছু করে সবই পড়িবে। কোন কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা চলিবে না। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—ইহাও গীতার মহাবাক্য নহে। যাহারা যোগমার্গে আরোহণ করিতে উদ্যত সেই সকল শিষ্যের ইহা কেবল প্রথমাবস্থার উপযোগী শিক্ষা। পরবর্ত্তী অবস্থায় এই শিক্ষা একরকম পরিত্যাগই করিতে হয়। কারণ পরে গীতা খুব জোরের সহিত বলিয়াছে যে মানুষ কর্ম্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে। ত্রিগুণময়ী

মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করে—মানুষকে শিখিতেই হইবে যে সে কর্ম্ম করে না। অতএব, "কর্ম্মে অধিকার" এ কথাটা শুধু ততক্ষণই খাটিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদিগকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নই—তখনই ফলের অধিকারের মত আমাদের কর্ম্মেরও অধিকার ঘুচিয়া যাইবে। তখন কর্ম্মীর অহঙ্কার—ফলে দাবী বা কর্ম্মে অধিকার, সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রকৃতির কর্তৃত্বই গীতার শেষ কথা নহে। ইচ্ছার সমতা এবং কর্ম্মফল পরিত্যাগ, চিত্ত মন বুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্ চৈতন্যে প্রবেশ করিবার এবং তন্মধ্যে বাস করিবার উপায় মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যতদিন শিষ্য এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে না পারিতেছে ততদিনই এইগুলিকে উপায় রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। (দ্বাদশ অধ্যায়ে ৮,৯,১০ ও ১১শ্লোক দেখ)। আরও কথা, কৃষ্ণ যে নিজেকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ইনি কে? ইনি পুরুষোত্তম—যে পুরুষ কর্ম্ম করে না তাহার উপরে, যে প্রকৃতি কর্ম্ম করে তাহারও উপরে। তিনি একটির ভিত্তি, অপরটির প্রভু। নিখিল সংসার যাহার প্রকাশ তিনি সেই ঈশ্বর—যিনি আমাদের মত মায়াবদ্ধ জীবেরও হৃদয়ে বসিয়া প্রকৃতির কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রের সৈন্য বাহিনী বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহার দ্বারাই ইতিপূর্ব্বে নিহত হইয়াছে, তিনিই এই মহা হত্যাকাণ্ডে অর্জ্জুনকে যন্ত্র বা নিমিত্তের মত ব্যবহার করিতেছেন। প্রকৃতি কেবল তাঁহারই কার্য্যকারিণী শক্তি। (executive force)। শিষ্যকে এই শক্তির, এবং ইহার তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে, তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; তাঁহাকে প্রকৃতির নিকট কর্ম্ম

সমর্পন করিতে হইবে না—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইচ্ছা সমস্ত তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পূর্ণ সমতা পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ আত্মদান সহ—সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের ঈশ্বরের পূজা স্বরূপ তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। সেই ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইতে হইবে, সেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান মিলাইতে হইবে—তাহা হইতেই কর্ম্মাকর্ম্ম স্থির করিতে হইবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে। শিষ্যের সকল সন্দেহের মীমাংসা ভগবান এইরূপেই করিয়াছেন।

গীতার শ্রেষ্ঠ কথা কি, মহাবাক্য কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। কারণ শেষে গীতাই ইহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—ইহাই গীতা শিক্ষার চরম কথা—"হে ভারত, সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের শরণ লও; তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং পরমেশ্বরের সম্বন্ধীয় নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। সর্ব্ববিধ গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, পরম পুরুষার্থ সাধন, আমার বাক্য পুনরায় শ্রবন কর—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—তুমি মদেকচিত্ত হইয়া একমাত্র আমারই উপাসক হও, একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়; অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।"

(কর্ম্মকে মানবীয় স্তর হইতে ঐশ্বরীয় স্তরে তুলিবার, গীতা তিনটি ধাপ দেখাইয়া দিয়াছে।) এইরূপেই কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দৈব জীবনের স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। (প্রথম, সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সমতার সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।) এই অবস্থায় মানুষ নিজেকেই কর্ম্মী বলিয়া মনে করে, পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করে না। ইহাই প্রথম ধাপ। (দ্বিতীয়তঃ শুধু, কর্ম্মফলে নহে, কর্ম্মেও যে অধিকার নাই তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, আত্মা স্বয়ং কিছু করেন না—যিনি ইহা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করেন, তিনিই এই দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।) শেষে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত পুরুষোত্তমকে চিনিতে হইবে। প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমের দাসী মাত্র, প্রকৃতিস্থ পুরুষ তাঁহার অংশ বিশেষ। তিনি সকলের অতীত হইয়াও প্রকৃতির দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। তাঁহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, স্তুতি করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্ম যজ্ঞরূপে তাঁহাকেই সমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহারই শরণ লইতে হইবে—সমগ্র চৈতন্যকে তুলিয়া সেই দেব চৈতন্যের মধ্যে বাস করিতে হইবে—যেন মানবাত্মা সেই পুরুষোত্তমের সহিত প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারে এবং তাঁহারই সহচর হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিতে পারে।)

কর্ম্মযোগই প্রথম ধাপ।—এই অবস্থায় স্বার্থশূন্য হইয়া ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।—গীতা যে বারবার কর্ম্ম করিবার কথা বলিয়াছে, তাহা এই অবস্থারই উপযোগী কথা। জ্ঞানযোগ দ্বিতীয় ধাপ। এই অবস্থায় আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ

করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় গীতা বার বার জ্ঞানলাভের কথাই বলিয়াছে। কিন্তু, এখানেও যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে—এখানে কর্ম্মের পথ শেষ হয় না, জ্ঞানের পথের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়।—ভক্তি-যোগই শেষ ধাপ। এই অবস্থায় ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতার উদয় হয় এবং এই অবস্থায় গীতা বার বার ভক্তির কথাই বলিয়াছে। কিন্তু, এখানেও জ্ঞান বা কর্ম্মের শেষ হয় না—তবে তাহাদের উন্নতি ও চরম পরিণতি হয়: জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনটি পথ মিলিয়া এক হয়। যে ফলের আকাঙ্খা সকল সময়েই সাধকের মধ্যে থাকে তখন সেই ফল লাভ হয়—ভগবানের সহিত মিলন হয়, এবং ঐশ্বরীয় প্রকৃতির সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র

গীতায় কিরূপে ক্রমশঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে আর একবার সেই অবস্থাটী অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। সেই অবস্থাটি শুধু মানবজীবনের নহে—সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চেরই নমুনা স্বরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ যদিও অর্জ্জুন শুধু নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেই চাহেন—তথাপি তিনি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যে ভাবে সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—তাহাতে মানবজীবনের ও কর্ম্মের গূঢ় রহস্য কি, জগৎ কি, মানুষ জগতে থাকিলেও কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে পারে—সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গীতার গুরু অর্জ্জুনকে কোন আদেশ দিবার পূর্ব্বে এই সকল কঠিন ও গূঢ় তত্ত্বেরই মীমাংসা করিতে চান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারেও থাকিতে চায়, কর্ম্ম করিতেও চায় অথচ ভিতরে অধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে চায়—তাহার প্রতিবন্ধক কি? সৃষ্টির কোন দিকটা প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল? সাধারণ পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের মিথ্যা আবরণে বিশ্বজগতের—প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকটে লুক্কায়িত থাকে! যখন সেই আবরণ খুলিয়া পড়ে, প্রকৃত জগৎ যাহা যখন আমরা তাহার সম্মুখীন

হই—অথচ উচ্চ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারি না—তখন নিদারুণ আঘাতে জাগিয়া জগতের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। অর্জ্জুন সহসা এইরূপ জগতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই প্রকৃত স্বরূপ কি? বাহ্যতঃ এই স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে প্রকট হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে জগতের এই স্বরূপ অর্জ্জুন দেখিলেন ভগবানের বিশ্বরূপে—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ
লোকান সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

কালরূপী ভগবান নিজের সৃষ্ট জীবগণকেই সংহার করিতেছেন, গ্রাস করিতেছেন। সর্ব্বভূতের যিনি ঈশ্বর, তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই আবার সকলের সংহার কর্ত্তা। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহারই নির্ম্মম ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে—পণ্ডিত ও বীরগণ তাঁহার খাদ্য, মৃত্যু তাঁহার ভোজের চাটনি! ইহা সেই একই সত্য যাহা প্রথমে পরোক্ষ ভাবে সংসারের ব্যাপারে দৃষ্ট হয় এবং পরে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট আত্মার দর্শনে প্রতিভাত হয়। জগৎ ও মানবজীবন যুদ্ধ, বিরোধ, হত্যার ভিতর দিয়া চলিতেছে—ইহাই বিশ্বের বাহ্য স্বরূপ। বিশ্ব সত্তা বিরাট সৃষ্টি এবং বিরাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—ইহাই ভিতরের দিক।—জীবন একটি বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং মৃত্যুভূমি—ইহাই কুরুক্ষেত্র। সেই হত্যাভূমিতে অর্জ্জুন ভগবানের ভীষণরূপ দর্শন করিলেন।

গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলিয়াছেন যে যুদ্ধই সকল বস্তুর জন্মদাতা, যুদ্ধই সকলের রাজা। গ্রীক পণ্ডিতদের অন্যান্য বচনের ন্যায় এই কথাটির ভিতরেও গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। জড় বা অন্যান্য শক্তির সংঘাতেই

জগতের সমস্ত বস্তুর, এমন কি জগতেরও উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। শক্তি ও বস্তুনিচয়ের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাত বিরোধের দ্বারাই জগৎ চলিতেছে, নূতন সৃষ্টি হইতেছে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে—এই সকলের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি তাহা কেহ জানে না। কেহ বলে শেষে আপনা আপনি সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—কেহ বলে ধ্বংসের পর সৃষ্টি আবার সৃষ্টির পর ধ্বংস—অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপে অর্থহীন বৃথা চক্র ঘুরিতেছে। যাহারা আশাবাদী তাহারা বলে—সমস্ত বাধা বিপত্তি ধ্বংসের ভিতর দিয়া জগৎ ক্রমশঃই উন্নতির পথে, ভগবানের কোন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। তবে যাহাই হউক এটা ঠিক যে এ জগতে ধ্বংস ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, বিভিন্ন শক্তির বিরোধ ছাড়া কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বদা অন্যের জীবন গ্রাস না করিলে কাহারও পক্ষে জীবন ধারণই সম্ভব নহে। শারীরিক জীবন ধারণ করিতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে মরিতে হইতেছে—এবং নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। আমাদের শরীর একটি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত নগরের ন্যায়। একদল ইহাকে আক্রমন করিতেছে, আর একদল ইহাকে রক্ষা করিতেছে—পরস্পরকে বিনাশ করা গ্রাস করাই পরস্পরের কাজ। সমস্ত জগৎই এইরূপ। সৃষ্টির প্রথম হইতেই যেন এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে—"তোমার সহচর, তোমার পরিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ না করিলে তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে না। এমন কি যুদ্ধ না করিলে, অপরের জীবন গ্রাস না করিলে তুমি বাঁচিতেই পারিবে না। জগতের প্রথম বিধান আমি এই করিয়াছি যে ধ্বংসের দ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা হইবে।"

প্রাচীন মনীষিগণ জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই

উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাচীন উপনিষদসমূহে ইহা স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—সেখানে এই কঠোর সত্যকে মিষ্ট কথায় ঢাকিবার কোনরূপ চেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ক্ষুধারূপী মৃত্যুই জগতের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা। যজ্ঞের অশ্বকে তাহারা প্রাণী মাত্রের রূপক করিয়াছিলেন।—জড় পদার্থের তাহারা যে নাম দিয়াছিলেন তাঁহার সাধারণ অর্থ হইতেছে খাদ্য। তাঁহারা জড়কে খাদ্য বলিয়াছেন—কারণ ইহা জীবকে খায় এবং জীব ইহাকে খায়। ভক্ষক মাত্রই ভুক্ত হয়—ইহাকেই তাহারা জড় জগতের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। ডারউনের মতাবলম্বিগণ এই সত্যকে পুনরাবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে বাঁচিবার জন্য যুদ্ধই বিবর্ত্তনের বিধান। হিরাক্লিটাসের বচন এবং উপনিষদের রূপকের দ্বারা যে সত্য স্পষ্ট নিভুর্ল ভাবে তেজের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখন তাহাই অস্পষ্ট ভাবে প্রচার করিতেছে।

বিখ্যাত জর্ম্মণ দার্শনিক নীট্শে যুদ্ধকেই সৃষ্টির নীতি এবং যোদ্ধাকে, ক্ষত্রিয়কেই আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন। মনুষ্য প্রথম ও চরম অবস্থায় যাহাই হউক—সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-জীবনে যোদ্ধা হইতেই হইবে। নীট্শের এই সকল মতকে আমরা এখন যতই গালি দিই না কেন, ইহাদের ন্যায্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মতের অনুসরণ করিয়া নীট্শে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা মানিয়া লইতে না পারি—কিন্তু, জগতের যে ধ্বংসলীলার দিকে আমরা চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চাই—নীট্শে তাহা অতি স্পষ্টভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমাদিগকে এই কঠোর সত্য যে মনে পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে ভালই

হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা আমাদের ক্লৈব্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিবে! যাহারা জগতে দেখে শুধু প্রেম, শুধু জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য্য—কিন্তু প্রকৃতির করালরূপ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়, যাহারা ভগবানের শুধু শিবমূর্ত্তির পূজা করে কিন্তু তাঁহারা রুদ্রমূর্ত্তিকে অস্বীকার করে—তাহাদের স্বভাবতঃই দুর্ব্বলতা ও জড়তা আসিয়া থাকে। ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করিলে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয়তঃ জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাসুজি দেখিবার ও বুঝিবার মত সততা ও সাহস যদি আমাদের না থাকে তাহা হইলে জগতের ভিতর যে অনৈক্য ও বিরোধ রহিয়াছে আমরা কখনই তাহার সমাধান করিতে পারিব না। প্রথমে আমাদের দেখিতেই হইবে যে জীবন কি, জগৎ কি! তাহার পর সেগুলির যেরূপ হওয়া উচিত তাহাতে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা সহজ হইবে। জগতের এই যে অপ্রীতিকর দিকটা আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না, হয়ত ইহারই ভিতর এমন রহস্য লুক্কায়িত আছে—চরম সামঞ্জস্য স্থাপনে যাহার একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি এই দিকে লক্ষ্য না করি—তাহা হইলে সেই রহস্য হারাইয়া ফেলিতে পারি এবং তাহার অভাবে জীবন তত্ত্ব সমাধানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে। যদি ইহা শত্রু হয়, যদি ইহাকে জয় করিতে হয়, দূর করিতে হয়, বিনাশ করিতে হয়—তাহা হইলেও ইহাকে অবহেলা করা চলে না। অতীতে এবং বর্ত্তমানে ইহা কিরূপে জীবনের সহিত গভীর ভাবে জড়িত তাহার হিসাব আমাদিগকে লইতেই হইবে।

যুদ্ধ এবং ধ্বংস যে শুধু জড়জগতেরই সনাতন নীতি তাহা নহে, ইহা আমাদের মানসিক ও ধর্ম্ম জীবনেরও নীতি। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, জ্ঞানচর্চ্চা—কোন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ

ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। অহিংসাকেই এখনও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নীতি বলিয়া ধরা হয়—কিন্তু, অন্ততঃপক্ষে এখন পর্য্যন্ত মানুষ এবং জগতের অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রকৃত ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া, উন্নতি করা সম্ভব নহে। আমরা কি শুধু আধ্যাত্মিক শক্তির (Soul-force) ব্যবহার করিব—কোনরূপ শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ বা ধ্বংস করিব না, এমন কি আত্মরক্ষার জন্যও বলপ্রয়োগ করিব না? কিন্তু বর্ত্তমানে কত মানুষ, কত জাতি আসুরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া কত অত্যাচার করিতেছে, দলন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে, কলুষিত করিতেছে। যতদিন আত্মিক শক্তি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইতেছে ততদিন শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া যদি এই আসুরিক শক্তিকে বাধা না দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই আসুরিক শক্তি অপ্রতিহত ভাবে সহজেই ধ্বংস ও অত্যাচারের লীলা করিবে—এবং অপরে বলপ্রয়োগ করিয়া যত ধ্বংস সাধন করিতে পারে, আমরা বলপ্রয়োগে বিরত থাকিয়াই হয়ত তদপেক্ষা অধিকমাত্রায় ধ্বংস ও অত্যাচারের সহায়ক হইব। শুধু তাহাই নহে—আত্মিক শক্তি কার্য্যকরী হইলেও ধ্বংস সাধন করে। যাহারা চক্ষু মুদ্রিত না রাখিয়া এই শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এই আত্মিক শক্তি তরবারি ও কামান অপেক্ষা কত অধিক ভীষণ ও ধ্বংসকারী। যাহারা শুধু কর্ম্ম এবং কর্ম্মের অনতিপরিবর্ত্তী ফলের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া দূর পর্য্যন্ত দেখেন তাহারাই জানেন যে আত্মিক শক্তিপ্রয়োগের পরিণামফল কি ভীষণ—কত অধিক ধ্বংসসাধন হয়। শুধু পাপকে নষ্ট করা সম্ভব নয়—সেই পাপের দ্বারা যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে, টিকিয়া আছে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও বিনাশ সাধন হয়। আমরা

নিজের হাতে করিয়া ধ্বংস না করিলেও ধ্বংস হিসাবে তাহা কিছুই কম নহে।

আরও কথা এই যে আমরা যখনই কাহারও বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করি, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যে প্রবল "কর্ম্ম" শক্তি (Force of Karma) উদ্বুদ্ধ হয় সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের সাধ্যাতীত। বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তি (Military violence) লইয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি (Soul force) প্রয়োগ করিলেন, ফলে হুন, শক ও পল্লব সৈন্যগণ আক্রমণকারীর উপর পড়িল। আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য যখন নীরবে সকল সহ্য করে, তখন জগতের ভীষণ শক্তিসমূহ তাহার প্রতিশোধ লইতে জাগিয়া উঠে। যাহারা পাপ করিতেছে, অন্যায় অত্যাচার করিতেছে, বলপ্রয়োগ করিয়াও যদি তাহাদিগকে বন্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করা হয়—নতুবা, তাহাদের অপ্রতিহত অন্যায় অত্যাচারের ফলে তাহারা নিজেদের উপর ভীষণতর শাস্তি ও ধ্বংস আনয়ন করিবে। শুধু আমরা যদি আমাদের হস্তকে কলুষিত না করি এবং আত্মাকে অহিংসভাবাপন্ন না করি তাহা হইলেই জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংস উঠিয়া যাইবে না। মানবজাতির মধ্যে ইহার যে মূল রহিয়াছে তাহা উৎপাটিত করিতে হইবে। নিজেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেই এবং অন্যায় অত্যাচারকে বাধা না দিলেই—যুদ্ধ ও হিংসা লোপ পাইবে না। অকর্ম্ম, তামসিকতা, জড়তা দ্বারা জগতে যত অনিষ্ট হয়, রাজসিকতা ও যুদ্ধ দ্বারা ততটা হয় না। অন্ততঃপক্ষে রাজসিকতার দ্বারা যত ধ্বংস হয় তদপেক্ষা অধিক সৃষ্টি হয়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ও ধ্বংস হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারই

নৈতিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতি উঠিয়া যাইবে না।

জগতে যুদ্ধনীতির প্রভাব কিরূপ অদম্য, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সৃষ্টির এই ভীষণ দিকটা যে আমরা একটু কোমল করিয়া দেখিতে চাই, অন্য দিকে ঝোঁক দিতে চাই, ইহা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সব নহে; একদিকে যেমন বিচ্ছেদ ও বিরোধ অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের সহিত মিলন ও সহযোগিতাও রহিয়াছে। প্রেমের শক্তি স্বার্থপরতা অপেক্ষা ন্যূন নহে। নিজের জন্য অপরকে নাশ করিবার যেমন প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তেমনই অপরের জন্য মরিবার প্রবৃত্তিও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু, এই সকল শক্তি কেমন ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য করি তখন আর তাহাদের বিপরীত গুলিকে উপেক্ষা করিতে বা সেগুলিকে তেমন ভাবে দেখিতে পারিব না। মানুষ যে শুধু পরস্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই সহযোগিতা করে তাহা নহে—শত্রুর বিনাশ সাধন করিতেও লোকে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে। সহযোগিতা অনেক সময় যুদ্ধ, অহঙ্কার প্রতিষ্ঠারই সহায়ক হইয়াছে। এমন কি প্রেমই সর্ব্বদা ধ্বংসের শক্তিরূপে ক্রীড়া করিয়াছে। বিশেষতঃ শুভের প্রতি প্রেম, ভগবানের প্রতি প্রেম জগতে বহু যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংস ঘটাইয়াছে। আত্মবলিদান খুবই মহান কিন্তু, চরম আত্মবলিদানের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে কোন শক্তির নিকট কাহাকেও বলিদান দেওয়া আবশ্যক, মরণের ভিতর দিয়া জীবনই সৃষ্টির নীতি? শাবককে রক্ষা করিতে পক্ষীমাতা আততায়ী জন্তুর সম্মুখীন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশভক্ত প্রাণ বিসর্জ্জন

দিতেছে, ধর্ম্মের জন্য, আদর্শের জন্য লোকে কত দুঃখ, কত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে—জীবজগতের নিম্ন ও উচ্চস্তরে এই সকলই আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত এবং এই সকল হইতে কি প্রমাণিত হয় তাহা সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু, আবার এই সকলের পরিণামের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে জগৎকে সুখময় বলিয়া ভাবা আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। দেখুন, যে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য শত শত দেশভক্ত একদিন প্রাণ দিয়াছে কিছুদিন পর যখন তাহাদের কর্ম্মের ফল ফুরাইয়া গেল তখন সেই দেশই অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেকে বড় করিতে ব্যস্ত! সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টান প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন, পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির (soul force) প্রয়োগ করিলেন যেন খৃষ্টের জয় হয়, খ্রীষ্টধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মিক শক্তির জয় বাস্তবিকই হইল, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল কিন্তু খৃষ্টের জয় ত হইল না। যে সম্রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সাম্রাজ্য অপেক্ষাও খৃষ্টধর্ম্ম এখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। জগতের ধর্ম্মগুলিই এখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরস্পরের সহিত লড়িতেছে, জগতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে।

এই সকল হইতেই বেশ বোধ হয় যে জগতে এই যে একটা জিনিষ রহিয়াছে, সেটিকে কেমন করিয়া জয় করিতে হইবে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ইহাকে জয় করা সম্ভব নয়, নয় আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দৃঢ়তার সহিত এই জিনিষটাকে তাকাইয়া দেখি নাই, এটাকে ভালরূপে জানিবার চেষ্টা করি নাই, তাই এপর্য্যন্ত জয় করিতে পারি নাই। জগৎ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে জগৎটা বাস্তবিক যাহা তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতেই হইবে। জগৎকে দেখা আর ভগবানকে দেখা এক—

কারণ, দুইটিকে পৃথক করা চলে না। যিনি জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এই জগতের আইনকানুন, নীতির জন্য দায়ী করা চলে না। কিন্তু এখানেও আমরা ইতস্ততঃ করি, সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করি। আমরা বলি ভগবান দয়া, প্রেম ও ন্যায়ের আধার—জগতে যাহা কিছু অশুভ আছে, পাপ আছে, নিষ্ঠুরতা আছে সে সকল তাঁহার কৃত নহে, সয়তানের কৃত। ভগবান কোন কারণে এই সয়তানকে মন্দ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন অথবা ভগবান প্রথমে সবই শুভ ও পুণ্যময় করিয়া গড়িয়াছিলেন কিন্তু, মানুষ তাহার পাপের দ্বারা জগতে অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। যেন মানুষই মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছে, জীব-জগতে গ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস করিতেছে—ইহাও যেন মানুষেরই বিধান! জগতের অতি অল্প ধর্ম্মই ভারতের মত খোলাখুলি ভাবে বলিতে সাহস করিয়াছে যে এই রহস্যময় জগতের একটিই কর্ত্তা, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনই এক ভগবানের কার্য্য, বিশ্বশক্তি শুধু সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা নহে, করালী কালীও বটে। রুধিরাক্তকলেবরা ধ্বংস-নৃত্য-পরায়ণা কালীমূর্ত্তিকে দেখাইয়া হিন্দুই বলিতে পারিয়াছে—"ইনিও মা, ইহাকে ভগবান বলিয়া জান—যদি সাধ্য থাকে ইহার পূজা কর।" যে ধর্ম্মে এইরূপ অবিচলিত সততা এবং অসীম সাহস, সেই ধর্ম্মই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও বিস্তৃত আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। কারণ, সত্যই প্রকৃত আধ্যাত্মিকার ভিত্তি এবং সাহস তাহার প্রাণ।

তবে আমরা একথা বলিতে চাই না যে যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সৃষ্টির মূল কথা, সামঞ্জস্য যুদ্ধ অপেক্ষা বড় নহে, মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমেই ভগবানের অধিক প্রকাশ নহে। পাশবিক বলের পরিবর্ত্তে আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা

করিতে, যুদ্ধ উঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে, বিরোধের স্থানে মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে, গ্রাসের বদলে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে, স্বার্থপরতার স্থানে সার্ব্বজনীনতা স্থাপন করিতে, মৃত্যুর বদলে অমরত্ব লাভ করিতে যে চেষ্টা করিতে হইবে না তাহাও আমরা বলি না। ভগবান শুধু ধ্বংস-কর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদও বটেন। ভীষণা কালীই সর্ব্বমঙ্গলা মা। কুরুক্ষেত্রের কর্ত্তাই আবার অর্জ্জুনের সখা ও সারথি, জীবের প্রাণারাম, অবতার কৃষ্ণ। সমস্ত বিরোধ, যুদ্ধ, গোলমালের ভিতর দিয়া তিনি যে আমাদিগকে কোন শুভের দিকে, দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতে-ছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! তবে এটা ঠিক যে আমরা যে যুদ্ধ ও বিরোধের কথা এত করিয়া বলিতেছি—এসবের উপরেই লইয়া যাইতে-ছেন। কিন্তু, কোথায় কেমন করিয়া, কিরূপে তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইলে জগৎটা এখন বাস্তবিক কিরূপ তাহা আমাদিগকে জানিতেই হইবে—ভগবানের কর্ম্ম এখন কিরূপ তাহা বুঝিতেই হইবে তাহার পর আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পথ আমাদের সম্মুখে ভাল করিয়া প্রতিভাত হইবে। আমাদিগকে কুরুক্ষেত্র স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অমরত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে—মৃত্যুর দ্বারাই জীবন, এই নীতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কাল ও মৃত্যুর কর্ত্তার সম্মুখে চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—অর্জ্জুনের মত অত ভয় খাইলে চলিবে না! বিশ্বসংহারকর্ত্তাকে অস্বীকার করিলে ঘৃণা করিলে, প্রত্যাখান করিলে চলিবে না।

PUBLIC LIBRARY
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ
সাধারণ পুস্তকালয়
ESTD. 1856

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনুষ্য ও জীবন যুদ্ধ

অতএব গীতার সর্ব্বব্যাপী শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতা জগতের প্রকাশ্য স্বরূপ ও পদ্ধতি যেরূপ নির্ভয়ে অবলোকন করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের দেব সারথি একদিকে সকল জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বজীবের বন্ধু ও সর্ব্বজ্ঞ গুরুরূপে প্রতীয়মান, অন্যদিকে তিনিই আবার জনগণের ক্ষয়সাধনকারী ভীষণ কাল—লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। গীতা এবিষয়ে সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ইহাকেও ভগবান বলিয়াছে, জগৎরহস্যের এই দিকটা চাপা দিবার চেষ্টা করে নাই। কেহ বলে এই জগৎ জড়শক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। কেহ বলে এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য নহে, ইহা মিথ্যা—সনাতন, অক্ষর অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র। কিন্তু গীতা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বলে যে তিনি স্বকৃত মহাশক্তি চালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; তিনি মায়া, প্রকৃতি বা শক্তির দাস নহেন—প্রভু; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না—অতএব, জগৎ পদ্ধতির কোন বিশেষ অংশের জন্য তিনি ভিন্ন আর কেহ দায়ী নহেন। যাহারা গীতার এই মত স্বীকার করেন তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করা বড় কঠিন। জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অসীম অজ্ঞাত শক্তি সমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া দৃশ্যতঃ অশেষ গোলমালের সৃষ্টি করিতেছে, এখানে কোন জীবন অনবরত পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু ভিন্ন টিকিতে

পারে না, চতুর্দ্দিকে ব্যথা, যন্ত্রণা, অমঙ্গল ও ধ্বংসের ভয়—এই সকলের ভিতর সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে দেখিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে যে এই রহস্যের নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে, এই অজ্ঞানের উপর নিশ্চয়ই এমন জ্ঞান আছে যাহার দ্বারা সকলের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে—"তুমি যদি মৃত্যুরূপে এস, তথাপি তোমারই উপর আমি নির্ভর করিব।" জগতের যত ধর্ম্মমতের দ্বারা মানুষ চালিত হয় তাহাদের ভিতরে কম বা বেশী স্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসই নিহিত রহিয়াছে।

অতএব মানব জীবনে যে বিরোধ ও যুদ্ধ আছে এবং তাহা যে সময়ে সময়ে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় মহা সন্ধিক্ষণে পরিণত হয় ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ যুগান্তর ও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিরাট ধ্বংস ও পুনর্গঠনের জন্য মহাশক্তিসমূহের সংঘাত উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ এরূপ যুগান্তর ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভিতর দিয়া সংঘটিত হয়। এইরূপ যুগসন্ধিকে গীতা-শিক্ষার কাঠামো করা হইয়াছে। জগতে এরূপ ভীষণ যুগপরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই গীতা অগ্রসর হইয়াছে। গীতা নৈতিক জগতে পাপ ও পুণ্যের বিরোধ, শুভ ও অশুভের বিরোধ যেমন স্বীকার করিয়াছে, তেমনি সাধু ও দুষ্কৃতের মধ্যে শারীরিক যুদ্ধও স্বীকার করিয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা যখন রচিত হয়, এখন অপেক্ষা তখন মানব জীবনে যুদ্ধ আরও অধিক প্রয়োজনীয় ছিল এবং জীবন হইতে যে যুদ্ধ কখনও উঠিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। সকল মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাব না হইলে স্থায়ী ও প্রকৃত

শান্তি কখনও সম্ভব নহে। এরূপ সদ্ভাব ও সর্ব্বব্যাপী শান্তির আদর্শ মনুষ্য তখন মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রহণ করিতে পারে নাই; কারণ সমাজে, ধর্ম্মে, আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতি তখন ইহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই—প্রকৃতিও এরূপ বিধান বরদাস্ত করিবার মত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। এমন কি এখনও আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া নিকৃষ্ট রকমের যুদ্ধ ও বিরোধের হাত এড়ান ভিন্ন আর কিছুই করা সম্ভবপর হয় নাই। এই টুকুই করিবার নিমিত্ত স্বভাবের বশে মানবজাতিকে যে নৃশংস যুদ্ধ ও রক্তপাতের অবতারণা করিতে হইয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। এই যে শান্তি—ইহারও ভিত্তি মানবচরিত্রের কোন গভীর পরিবর্ত্তনের উপর স্থাপিত হয় নাই। অর্থনৈতিক অসুবিধা, প্রাণহানি করিতে বিতৃষ্ণা, যুদ্ধের বিপদ ও ভীষণতা এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দ্বারা শান্তি রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ভিত্তি যে খুব দৃঢ় এবং তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন এক দিন আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে যখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক অবস্থা সর্ব্বব্যাপী শান্তির অনুকূল হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ধর্ম্মকেই যুদ্ধ এবং যোদ্ধারূপে মানুষের কর্ত্তব্যের মীমাংসা করিয়া দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে মানবজীবন কিরূপ হইতে পারে শুধু তাহাই না ধরিয়া, উহা এখন বাস্তবিক যেরূপ, গীতা তাহাই ধরিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে যে যুদ্ধের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা করা যাইতে পারে?

সেই জন্যই গীতার শিক্ষা একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট কথিত হইয়াছে। যুদ্ধ ও দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। সমাজে অন্য কার্য্য করিতে হয় বলিয়া

যাহারা নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাদিগকে আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা দুর্ব্বল ও নির্য্যাতিত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং জগতে ন্যায় ও ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়।—ভারতে ক্ষত্রিয় শুধু সৈনিক নহেন—ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষা তাহার ধর্ম্ম, স্বভাবতঃ তিনি আর্ত্তের রক্ষক এবং দেশের পালনকর্ত্তা ও রাজা।—যদিও গীতার সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব ও কথা গুলিই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তথাপি যে বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার মাঝে ইহার উৎপত্তি তাহারও হিসাব লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র হইতে তাহা বিভিন্ন। এখন আমরা মানুষকে একাধারে জ্ঞানী, ব্যবসায়ী এবং যোদ্ধা বলিয়াই দেখি। বর্ত্তমান সমাজে এই সকল কর্ম্মের তেমন বিভাগ নাই—আমরা চাই প্রত্যেক লোকেই সমাজকে কিছু জ্ঞান দিক, কিছু অর্থ সঞ্চয় করুক, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধও করুক—কোন ব্যক্তির প্রকৃতি কোন রকম কার্য্যের অনুকূল আমরা তাহার হিসাব লইতে চাই না। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিত এবং তদনুসারে সমাজে তাহায় স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। সামাজিক কর্ত্তব্য পালনই তখন মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইল না—সমাজে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করাই তখন ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ধ্যান ও জ্ঞান, যুদ্ধ ও দেশশাসন, ধনোৎপাদন ও আদান প্রদান, শ্রম ও সেবা—সমাজের কর্ত্তব্য এই চারিভাগে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। যেরূপ কার্য্য যাহার স্বভাবের অনুযায়ী এবং যেরূপ কার্য্যের দ্বারা যাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতির সুবিধা সেইরূপ কার্য্যেই সেইরূপ লোককে নিযুক্ত করা হইত।

বর্ত্তমান যুগের যে ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের জন্য সকল মানুষেরই সাধারণ ভাবে দায়িত্ব রহিয়াছে সে ব্যবস্থারও কতক সুবিধা আছে। এরূপ ব্যবস্থার গুণে সামাজিক জীবনে অধিকতর দৃঢ়তা, একতা, পূর্ণতার সুবিধা হয়। অন্যদিকে প্রাচীন প্রথামত কর্ম্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করিতে যাইয়া ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষে ক্রমে অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সঙ্কীর্ণতা, অনৈক্য আসিয়াছে, জাতিগত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনেককে স্বভাবের বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে হইতেছে। তবে আধুনিক প্রথারও অসুবিধা রহিয়াছে। অনেক সময় এই প্রথার ফল এতদূর গড়াইয়াছে যে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ বিবেচনা করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক প্রথা অনুসারে স্বদেশের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করিতে সকল মনুষ্যই সাধারণ ভাবে বাধ্য। ইহার ফল হইয়াছে এই যে এখন কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, পুরোহিত, ব্যবসাদার, শিল্পী, সকলকেই আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে ছিন্ন করিয়া মরিতে ও মারিতে, পরিখার ভিতর পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সমগ্র সমাজ-জীবনে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, লোকের জ্ঞান ও বিবেককে অমান্য করা হয়। এমন কি যে ধর্ম্মযাজক শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেও বাধ্য হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় এবং কসাইয়ের মত মানুষ মারিতে হয়। এইরূপে সামরিক ষ্টেটের আদেশে শুধুই যে মানুষের বিবেক ও স্বধর্ম্মকেই বলি দেওয়া হয় তাহা নহে, জাতি রক্ষার অত্যধিক আগ্রহে জাতীয় আত্মহত্যারই পথ সুন্দর-রূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যদিকে যুদ্ধের উৎপাত ও অনর্থ যতদূর সম্ভব কমানই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধকার্য্যটার ভার এক শ্রেণীর লোকের উপরই দেওয়া ছিল। এই শ্রেণীর লোক জন্ম, স্বভাব ও বংশগৌরবের দ্বারা এই কার্য্যের প্রকৃত ভাবে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যুদ্ধ কার্য্যের দ্বারাই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইত। একটা উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া যাহারা যোদ্ধার জীবন যাপন করেন তাহাদের সাহস, শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সহযোগিতা, শৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়া তাহাদের আত্মার উন্নতি হইবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হয়। সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক উক্ত শ্রেণীর দ্বারা সর্ব্বদা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কার্য্য করিতেন। নিজ নিজ কার্য্য ও ব্যবসায়ে ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত না। যুদ্ধ অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় যুদ্ধের দ্বারা সমাজের সাধারণ জীবনে ক্ষতি খুব কমই হইত। উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং যতদূর সম্ভব দয়া সৌজন্য প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর না করিয়া উচ্চহৃদয় ও উন্নতই করিত। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা এইরূপ যুদ্ধের কথাই বলিয়াছে—জীবন হইতে যুদ্ধকে যখন বাদ দেওয়া চলে না, তখন এরূপ ভাবে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন তাহা অন্যান্য কর্ম্মেরই ন্যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই তখন জীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের শরীর ধ্বংস হইত

বটে কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন জীবন এবং জাতির নৈতিক জীবন সুগঠিত হইত। উচ্চ আদর্শের দ্বারায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রাচীনকালে যুদ্ধ যে শৌর্য্য ও সৌজন্য বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, অতি বড় গোঁড়া অহিংসাবাদী ভিন্ন সকলেই সে কথা স্বীকার করিবেন। ইউরোপের নাইট্, ভারতের ক্ষত্রিয় এবং জাপানের সামুরাই জাতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের দ্বারা মানবজাতির যে কল্যাণ হইতে পারে তাহা যদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে যুদ্ধ উঠিয়া যাউক; গঠন শক্তি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত যুদ্ধ নিষ্ঠুর হিংসাকাণ্ড মাত্র এবং এরূপ যুদ্ধ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হইবে বটে কিন্তু আমাদের বিবর্ত্তনের যুক্তিসঙ্গত বিচার করিতে হইলে, যুদ্ধের দ্বারা অতীতে জাতির যে কল্যাণ হইয়াছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে যাহাই হউক শারীরিক যুদ্ধ জীবনের এক সাধারণ নীতির এক বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র! মানবজাতিকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে যে সকল সাধারণ গুণের প্রয়োজন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তাহার একটির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। এই জগতে আমাদের আভ্যন্তরীন ও বাহ্য জীবনে সর্ব্বত্রই যুদ্ধ ও বিরোধের যে একটা দিক আছে, শারীরিক যুদ্ধ তাহার বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। জগতের ধারাই এই যে শক্তিসমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াই নিত্য নূতন মিটমাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশা হয় এমনই করিয়া একদিন সকল বিরোধের অবসান হইবে, পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু কোন একত্বের উপর এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এ পর্য্যন্ত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মানুষের মধ্যে যে ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে তাহা জীবনের এই নীতি স্বীকার করে এবং ইহাকে জয় করিতে যোদ্ধারূপে ইহার সম্মুখীন হয়,

শরীর বা বাহ্য আকারকে ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু এই সকল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এমন এক নীতি, এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শেষ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। বিশ্বশক্তির এই দিকটাকে এবং ইহার বাহ্য নিদর্শন শারীরিক যুদ্ধকে গীতা স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার শিক্ষা একজন কর্ম্মী, যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়কে বিবৃত করিয়াছে। ভিতরে শান্তি, বাহিরে অহিংসা—এই যে আত্মার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। যোদ্ধার, ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বকোলাহলময় জীবন নীরব আত্মজয় ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। এই বিরোধের মধ্যে কোথায় সামঞ্জস্যের সূত্র রহিয়াছে গীতা তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের অতীত শেষ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

যে মানুষের প্রকৃতিতে যে গুণের প্রভাব অধিক সেই গুণ অনুসারেই সেই মনুষ্য জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়! সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক; জগতের প্রত্যেক বস্তু ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছে। গীতা বলে,—

> "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
> সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাৎ ত্রিভিগু´ণৈঃ। ১৮।৪০

"পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিসম্ভূত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।"

অতএব মানব প্রকৃতিরও তিন প্রধান গুণ আছে। শান্তি, জ্ঞান, সুখ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। তৃষ্ণা, আসক্তি, কর্ম্ম রজোগুণের স্বরূপ।—অজ্ঞান ও আলস্য তমোগুণের লক্ষণ।' যাহাদের প্রকৃতিতে তমোগুণের প্রাধান্য

তাহারা জগতের শক্তিসমূহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, সহজেই অভিভূত, নিপীড়িত হয়, তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে।—তামসিক মনুষ্যেরা অন্য গুণের কিছু সহায়তা পাইলে কোনরূপে যতদিন সম্ভব টিকিয়া থাকিতে চায়, বাঁধা বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযুদ্ধ হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, কোন উচ্চ আদর্শের ডাকে চেষ্টা করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি করে না। যাহাদের প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রাধান্য তাহারা উৎসাহের সহিত জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং জগতে শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কার্য্যে লাগাইতে চেষ্টা করে—তাহারা চায় জয় করিতে, প্রভুত্ব করিতে, ভোগ করিতে। রাজসিক মনুষ্যেরা যদি কতকটা সত্ত্বগুণের সাহায্য পায় তাহা হইলে তাহারা এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আন্তরিক রিপুগণকে জয় করিতে চায়, হর্ষ চায়, শক্তি চায়। জীবনযুদ্ধে তাহারা বেশ আনন্দ পায়, এটা তাদের একটা নেশার মত হয়, কারণ প্রথমতঃ জীবনযুদ্ধে তাহারা কর্ম্মের যে আনন্দ, সবলতার যে সুখ তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ পায়; দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি, তাহাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সুবিধা হয়। যাহাদের উপর সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক তাহারা এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ধর্ম্ম, নীতি, সামঞ্জস্য, শান্তি সুখের সন্ধান করে। যে সকল মনুষ্য খাঁটি সাত্ত্বিক তাহারা অন্তরের ভিতরেই এই শান্তির সন্ধান করে। তাহারা হয় শুধু নিজেদের জন্যই এই শান্তি চায় অথবা এই অভ্যন্তরীণ শান্তির বার্ত্তা অপরকেও জানাইয়া দেয় কিন্তু বাহ্যজগতের যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া বা তাহার প্রতি উদাসীন থাকিয়াই তাহারা শান্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু যে সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণেরও কিছু প্রভাব আছে তাহারা বাহিরে

শুদ্ধ দ্বন্দ্বের উপরই শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়—যুদ্ধ বিরোধ দ্বন্দ্বকে পরাজিত করিয়া জগতে শান্তি প্রেম সামঞ্জস্যের রাজত্ব স্থাপন করিতে চায়। এই তিনটি গুণের প্রভাব যাহার প্রকৃতিতে যেরূপ সে সেই ভাবেই জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

কিন্তু এরূপ অবস্থাও আসিতে পারে যখন মানুষ প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের খেলায় তৃপ্ত হইতে পারে না—হয় ইহার বাহিরে যাইতে চায় অথবা ইহার উপরে উঠিতে চায়। মানুষ এমন কোন অবস্থা চায় যাহা ত্রিগুণের বাহিরে, গুণশূন্য বা নির্গুণ। অথবা এমন অবস্থায় উঠিতে চায় যাহা সকল গুণের উপরে, যেখানে সকল গুণের প্রভু হওয়া যায়, কর্ম্ম করা যায় অথচ কর্ম্মের অধীন হইতে হয় না—মানুষ নির্গুণ অবস্থা চায় অথবা ত্রিগুণাতীত অবস্থা চায়। পূর্ব্বোক্ত ভাব মানুষকে সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়। শেষোক্ত ভাবের বশে মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে চায়, অপরা প্রকৃতির দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হয় না—কামনা ও বাসনাকে বর্জ্জন করিয়া আভ্যন্তরীণ সমতা লাভই এইরূপ ভাবের মূল নীতি। প্রথমে সন্ন্যাসের দিকে অর্জ্জুনের ঝোঁক হইয়াছিল। তাহার বীরজীবনের পরিণাম কুরুক্ষেত্রের বিরাট হত্যাকাণ্ড হইতে প্রথমে তিনি পিছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এতদিন তিনি যে নীতির বশে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন সেই নীতি হারাইয়া কর্ম্ম ত্যাগ, সংসার ত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন পথই তিনি খুঁজিয়া পান নাই!—কিন্তু তাহার উপর ভগবানের আদেশ হইল বাহ্যতঃ সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিতে হইবে,আত্ম জয় করিতে হইবে।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, রাজসিক মনুষ্য—তিনি সাত্ত্বিক আদর্শ অনুসারে তাহার রাজসিক কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। যুদ্ধে যে আনন্দ আছে তাহা

সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তিনি অসীম উল্লাসের সহিত কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন! কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন—এই গৌরবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। তাঁহার দ্রুতগামী রথে তিনি শঙ্খনিনাদে শত্রুগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন তিনি অবলোকন করিতে চান যে এই যুদ্ধে কাহারা দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্যের পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার ভিতরের এই আত্মবিশ্বাস যখন চূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সুঅভ্যস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তাঁহাকে মহা পাপের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে বলিয়া যখন তাঁহার ধারণা হইল, তখন তমোগুণ জাগিয়া উঠিয়া সেই রাজসিক মনুষ্যকে ঘিরিয়া ধরিল—বিস্ময়, শোক, ভয়, অবসাদ, মোহে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইল, তিনি অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বশীভূত হইলেন। ফলে সন্ন্যাসের দিকেই তাঁহার ঝোঁক হইল। এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়ঃ। রক্তপাত করিয়া যে ভোগের বস্তু সংগ্রহ করা হয় তাহাও রুধিরাক্ত। ধর্ম্ম ও নীতির নামে যে যুদ্ধ, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ সকলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সেই যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ, ত্রৈগুণ্য পরিত্যাগ—ইহাই সন্ন্যাস। কিন্তু, সন্ন্যাস অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইলে তিন গুণের কোনটির ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। তামসিকতার বশে মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার ও জীবনের প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা, ঘৃণার উদয় হয়, অক্ষমতা বোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহারা সংসার ছাড়িয়া পালাইতে চায়; অথবা রজোগুণ তমোর দিকে যাইতে পারে, তখন সংসারের শোক দুঃখ দ্বন্দ্ব

নিরাশায় পরিশ্রান্ত হইয়া মানুষ আর কর্ম্মের কোলাহল, জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে চায় না। সত্ত্বমুখী রজগুণের বশেও মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার যাহা দিতে পারে তাহা অপেক্ষা তাহারা উচ্চ বস্তু লাভ করিতে চায়। শুধু সত্ত্বগুণের বশেও মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সংসারের অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে—অথবা কালাতীত, অনন্ত, নীরব, নামরূপহীন শান্তির অনুভূতি লাভ করিয়াও মানুষ সংসার ছাড়িতে পারে। অর্জ্জুনের যে সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেটা হইতেছে সত্ত্বরাজসিক মনুষ্যের তামসিক বিরাগ। ভগবান গুরুরূপে অর্জ্জুনকে এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়াই তপস্বী জীবনের পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন। অথবা এখনই তাঁহার তামসিক বিরাগকে পবিত্র করিয়া সাত্ত্বিক সন্ন্যাসের অসাধারণ উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু, বাস্তবিক তিনি এই দুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামসিক বিরাগ এবং সন্ন্যাসের প্রতি ঝোঁককে নিন্দা করিলেন এবং অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে, এমন কি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার শিষ্যকে আর এক সন্ন্যাস, আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের যে সমস্যা তাহার ইহাই প্রকৃত মীমাংসা। এই রূপেই বিশ্বশক্তির উপর আত্মা প্রাধান্য লাভ করিবে অথচ সংসারে স্বাধীন ও শান্ত ভাবে কর্ম্মও করিতে পারিবে। বাহ্যিক সন্ন্যাস নহে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ—কামনা, বাসনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম *

শোকে দুঃখে, সন্দেহে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন যখন এই সংসারকে শূন্য ও অসার দেখিলেন, হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাপ কর্ম্মের পাপ পরিণামের কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাহার উত্তর স্বরূপ ভগবান তাহাকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। ভগবান উত্তর করিলেন যে অর্জ্জুনের এই ভাববুদ্ধির গোলমাল ও ভ্রম হইতে উৎপন্ন—ইহা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, ক্লৈব্য,—ক্ষত্রিয়োচিত, বীরোচিত ধর্ম্ম হইতে পতন। পৃথার পুত্রে ইহা শোভা পায় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তিনিই নায়ক, তিনিই ভরসা—এ হেন সঙ্কট সময়ে সেই ধর্ম্ম পক্ষ পরিত্যাগ করা তাহার উচিত হয় না, মোহবশে দেবদত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করা, ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। আর্য্যগণের অনুমোদিত ও অনুসৃত পথ ইহা নহে। এভাব স্বর্গের নহে, এপথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। ইহ জগতে মহৎ কর্ম্ম ও বীরত্বের দ্বারা যে কীর্ত্তি লাভ করা যায় এরূপ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অর্জ্জুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্য পরিত্যাগ করুক, উঠিয়া শত্রুগণের বিনাশ সাধন করুক।

কিন্তু, ইহা কি একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা দেবগুরুর উপযুক্ত উত্তর হইল? একজন ক্ষত্রিয় বীর আর একজন বীরকে এইরূপ উত্তর দিতে পারে। কিন্তু, ধর্ম্মগুরুর নিকট হইতে আমরা কি চাই না যে তিনি সর্ব্বদা কোমলতা,

* গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৩৮

সাধুতা, এবং আত্মত্যাগের উপদেশ দিবেন, সংসারের কাম্য, সাংসারিক চালচলন বর্জ্জন করিতে উৎসাহ দিবেন? গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন বীরের অনুচিত দুর্ব্বলতায় পতিত হইয়াছিলেন, তিনি অশ্রুপূর্ণাকুল-লোচন এবং বিষাদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি কৃপয়াবিষ্ট, কৃপা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই দুর্ব্বলতা কি দেবোচিত নহে? কৃপা কি দেবোচিত ভাব নহে যে ইহাকে এরূপ তীব্র তিরস্কার করিয়া দমাইয়া দিতে হইবে? জার্ম্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে বীরত্ব এবং গর্ব্বিত শক্তির নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, হিব্রু ও টিউটনিকগণ দয়া মায়াকে বীর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিতেন—আমরা কি তবে সেইরূপ যুদ্ধনীতি এবং কঠোর বীরোচিত কার্য্যেরই উপদেশ শুনিতেছি? কিন্তু, গীতার শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে দয়া চিরকালই দেবচরিত্রের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গীতারই গুরু শেষের এক অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে দেবোচিত গুণের বর্ণনা করিতে যেমন নির্ভীকতা ও তেজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি সর্ব্বজীবে দয়া, কোমলতা, অক্রোধ, অহিংসা এবং অদ্রোহের ও উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রূরতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা শত্রুবধে আনন্দ, ধনসঞ্চয়ে আনন্দ, অন্যায় ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে আনন্দ—এই সকল আসুরিক গুণ। যে সকল দুর্দ্দান্ত চরিত্র ব্যক্তি জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলে, মানুষের মধ্যে দেবত্ব অস্বীকার করে এবং কামনাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া পূজা করে তাহাদের চরিত্রকেই উল্লিখিত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।—অতএব অর্জ্জুন এইরূপ অসুরোচিত গুণ-সম্পন্ন নহে বলিয়া ভগবান তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।"—হে অর্জ্জুন, এ বিষম সঙ্কট সময়ে এই মোহ কেন তোমায়

আক্রমণ করিল? অর্জ্জুন তাঁহার বীরোচিত গুণ হইতে কিরূপ স্খলিত হইয়াছেন এই প্রশ্ন হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়। দয়া একটি দেবোচিত গুণ—ইহা স্বর্গ হইতে আমাদের নিকট নামিয়া আসে। যাহার চরিত্রে এই গুণ নাই, যে এইরূপ ধাতে তৈয়ার নয়, সে যদি নিজকে বড় বলে, আদর্শ মনুষ্য বলে, অতি-মানব বলে—তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে মূর্খতা, ধৃষ্টতা হইবে। কারণ, কেবলমাত্র তিনিই অতি-মানব, যাহার চরিত্রে ভগবদ্‌গুণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়াছে। মানুষের যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব, সবলতা ও দুর্ব্বলতা, তাহার পাপ পুণ্য, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার জ্ঞান অজ্ঞান, তাহার বিজ্ঞতা মূর্খতা, তাহার আশা নিরাশা এই সকল ব্যাপারকেই দয়াবান প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির চক্ষুতে দেখেন এবং সকল অবস্থাতেই সাহায্য করিতে চান, সান্ত্বনা দিতে চান। সাধু ও পরোপকারী-দের হৃদয়ে এই দেবোচিত দয়া যথেষ্ট প্রেম ও বদান্যের মূর্ত্তি ধারণ করে। পণ্ডিত ও বীরের হৃদয়ে এই দয়া কল্যাণকর জ্ঞান ও শক্তিরূপে প্রকট হয়। এই দয়াই আর্য্য ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্যের প্রাণ স্বরূপ—এই দয়ার বশেই ক্ষত্রিয়-বীর ছিন্ন লতাগুল্মকেও আঘাত করিতে চায় না, কিন্তু দুর্ব্বলকে, দলিতকে, আহতকে, পতিতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আবার এই দেবোচিত দয়াই দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীকে ধরাশায়ী করে, তবে তাহা ক্রোধ বা ঘৃণার বশে করে না, কারণ ক্রোধ বা ঘৃণা দেবোচিত উচ্চ গুণ নহে। পাপীর প্রতি ভগবানের ক্রোধ, দুষ্টের প্রতি তাঁহার ঘৃণা, এ সকল মিথ্যা গল্প নরকের যন্ত্রণার গল্পের মতই অর্দ্ধ শিক্ষিত ধর্ম্ম সমূহ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম স্পষ্টই দেখিয়াছিল যে দেবোচিত দয়ার বশে যে সকল ব্যথিত ও অত্যাচারিতকে অন্যায় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করা হয় তাহাদের প্রতি যেরূপ প্রেম ও করুণা থাকে—যে সকল ভ্রমান্ধ

দুর্দান্ত অত্যাচারী অসুরকে তাহাদের পাপের জন্য নিধন সাধন করিতে হয় তাহাদের প্রতিও সেইরূপই প্রেম ও করুণা থাকে।

কিন্তু যে ভাবের বশে অর্জ্জুন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তাহা সেই দেবোচিত করুণা নহে। অর্জ্জুন নিজের দুর্ব্বলতায়, নিজের কষ্টে পীড়িত, কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তাঁহার নিজের যে মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে তাহা সহ্য করিতে অর্জ্জুন নারাজ। তিনি স্পষ্টই বলিলেন—"আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে।" এরূপ দীনতা ও আত্ম-দৌর্ব্বল্যের ভাব আর্য্যগণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও অনার্য্যোচিত বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্জ্জুনের যে কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এক রকমের স্বার্থপরতা। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ অর্জ্জুনের "বান্ধব" "স্বজন"—তাই তাহাদিগকে বধ করিতে অর্জ্জুনের প্রাণ চাহিতেছিল না। এইরূপ কৃপা মনের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কৃপা নিম্ন অবস্থায় লোকের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে—তাহাদের হৃদয় কিছু দুর্ব্বল হওয়াই উচিত নতুবা তাহারা কঠিন ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িবে। কারণ তাহাদিগকে কোমল স্বার্থপরতার দ্বারা নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা দূর করিতে হইবে, তাহাদের দুর্দান্ত রাজসিক রিপুগণকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অবসাদক তমগুণের দ্বারা সত্ত্বকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু, অর্জ্জুনের পক্ষে এ পথ নহে, তিনি উন্নত চরিত্র আর্য্য। দুর্ব্বলতার সাহায্যে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে না—ক্রমশঃ তাঁহার শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। অর্জ্জুন দেবধর্ম্মী মানব—তিনি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য তৈয়ারী হইতেছিলেন, দেবতারা তাঁহাকেই ইহার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন! তাঁহাকে একটি কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, ভগবান তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার রথেই রহিয়াছেন,

তাঁহার হস্তে দৈবাস্ত্র গাণ্ডীব, তাঁহার সম্মুখে ধর্ম্মদ্রোহী, দেবদ্রোহী প্রতি-দ্বন্দ্বিগণ! এখন তিনি কি করিবেন না করিবেন—নিজের খেয়াল বা হৃদয়াবেগের বশে তাহা স্থির করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার স্বার্থপর হৃদয় ও বুদ্ধির বশে একটা আবশ্যকীয় ধ্বংসকাণ্ড হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া নিজের জীবন শূন্য ও দুঃখময় হইয়া যাইবে, এই ধ্বংসের দ্বারা তাঁহার নিজের পার্থিব কোন ফল লাভই হইবে না—এইরূপ স্বার্থপর চিন্তার বশে কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। এইরূপ মনোভাব তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি হইতে কেবল অধঃপতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্‌টা কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুধু ইহাই অর্জ্জুনকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার ক্ষত্রিয় স্বভাবের মধ্য দিয়া ভগবান কি আদেশ দিতেছেন, শুধু তাহাই শুনিতে হইবে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ তাঁহার কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে—সকল বাধা দূর করিয়া, সকল শত্রু বিনাশ করিয়া মানবজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন—ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে।

কৃষ্ণের ভর্ৎসনা অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণের আদেশ পালন করিলেন না—বরং আরও তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিলেন কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার চিত্তের দীনতাই তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত বীর স্বভাবকে অভিভূত করিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ় চিত্ত হইয়াই তিনি কৃষ্ণের নিকট শ্রেয়ঃ কি জানিতে চাহিলেন, (কৃষ্ণকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন) কিন্তু যে সকল হৃদয়ভাব, যে সকল ধ্যান ধারণা অনুসারে এত দিন তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতে ছিলেন তাহা ওলট পালট হইয়া যাওয়ায় এবং নূতন কিছু ধরিবার না পাওয়ায় অর্জ্জুন তাঁহার পুরাণো জীবনের উপযোগী একটা আদেশ মাথা পাতিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি এখনও তর্ক করিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই তাহার পক্ষে ঠিক হইবে; এই হত্যাকাণ্ড করিতে এবং ইহার ফলস্বরূপ রুধিরাক্ত ভোগ্যসমূহ উপভোগ করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিতেছে না। এই কর্ম্মের ফলে স্বজন-গণকে হারাইয়া তাঁহার জীবন কিরূপ শূন্য ও দুঃখময় হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতদিন যে ধারণা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তিনি ভীষ্ম দ্রোণের ন্যায় গুরুজনকে কেমন করিয়া বধ করিবেন? এই যে ভীষণ নৃশংসকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছে—ইহার যে কি সুফল হইতে পারে তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। তিনি যতদূর বুঝিতেছেন—এই ভীষণ কর্ম্মের ফল অতি অশুভই হইবে। এতদিন তিনি যে ধারণার বশে যে উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এখন আর সে ধারণায়, সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন এবং ভগবান তাহার অকাট্য যুক্তিগুলি কেমন করিয়া খণ্ডন করেন, নীরবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান প্রথমেই অর্জ্জুনের অহঙ্কৃত ও মমতাপন্ন স্বভাবের এই দাবীগুলি নষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। সকল অহঙ্কার ও মমতার উপরে যে ধর্ম্ম ইহার পর তাহা বিবৃত করিবেন।

ভগবান দুইটী বিভিন্ন পথ ধরিয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নের জবাব দিলেন। অর্জ্জুন যে আর্য্যশিক্ষায় শিক্ষিত তাহারই সর্ব্বোচ্চ ভাবগুলিকে ভিত্তি করিয়া ভগবান সংক্ষেপে প্রথম উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় যে উত্তর আরও গভীরতর জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি; এই উত্তর হইতে আমাদের

জীবনের অনেক গুহ্য কথা বুঝিতে পারা যায়—ইহাই গীতা শিক্ষার প্রকৃত আরম্ভ। বেদান্ত দর্শনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং আর্য্য সমাজের নৈতিক ভিত্তি স্বরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে সামাজিক ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের প্রথম উত্তর কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুন ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার যুদ্ধে পরাঙ্মুখতাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে অর্জ্জুন তাঁহার অজ্ঞান, অশুদ্ধ চিত্তের বিদ্রোহকেই মিথ্যা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শরীর ও শরীরের মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়াছেন যেন এই গুলিই চরম সত্য। কিন্তু জ্ঞানী বা পণ্ডিতেরা কখনই এরূপ মনে করেন না। বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোক প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত নহে। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আত্মার জীবনের বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। শরীর নহে, আত্মাই সত্য বস্তু। এই যে রাজগণের আসন্ন মৃত্যুর জন্য তিনি শোক করিতেছেন—ইহারা যে পূর্ব্বে কখন জীবন ধারণ করেন নাই তাহা নহে, ভবিষ্যতে যে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন না, তাহাও নহে। কারণ যেমন এই দেহে দেহোপাধি বিশিষ্ট জীবের কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাগুলির প্রাপ্তি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ। যাহারা শান্ত ও জ্ঞানী, যাহারা ধীর, যাহারা স্থির চিত্তে সংসারের ব্যাপার অবলোকন করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয় ও চিত্তের আবেগে বিচলিত ও মোহিত না হন, তাহারা জড় জগতের বাহ্যিক দৃশ্যে প্রতারিত হন না। তাঁহারা শরীরের স্নায়ুর, চিত্তের গোলমালে তাঁহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে মোহগ্রস্ত হইতে দেন না। তাঁহারা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের অতীত

জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পান এবং চিত্তাবেগ ও অজ্ঞান স্বভাবের শারীরিক বাসনা অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে পারেন।

সেই প্রকৃত সত্য কি? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য কি? তাহা এই,—যুগে যুগে মানুষ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কোন্ মনুষ্য প্রকৃত যোগ্য? যিনি নিজেকে শুধু শরীর ও প্রাণ বলিয়াই মনে করেন না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি নিজকে এবং সকলকেই আত্মা বলিয়া জানেন, যিনি আত্মার মধ্যেই বাস করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীব ভাবে নহে, আত্মা ভাবেই ব্যবহার করেন—তিনিই অমরত্ব লাভের প্রকৃত যোগ্য; কারণ মৃত্যুর পরও থাকাই অমরত্ব নহে—কারণ মন লইয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্ম মৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমরত্ব। মনোময় দেহ ছাড়াইয়া মানুষ যখন আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। যাহারা শোক দুঃখের অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনি[illegible]বিষয় সমূহের স্পর্শ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত তাহারা অমরত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যতদিন এই সকলকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে—শেষে এমন একদিন আসিবে যখন ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন—মুক্ত পুরুষও তেমনই শান্তভাবে সংসারের সুখ দুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন। অর্জ্জুনের

মত দুঃখ ও ভয়ে বিচলিত হওয়া, তাহাদের দ্বারা কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, আত্মকৃপা এবং অসহ্যবোধে দুঃখ দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবশ্যম্ভাবী তুচ্ছ শারীরিক মৃত্যুর সম্মুখে শিহরিয়া উঠা—ইহা অনার্য্যোচিত অজ্ঞান; যে আর্য্য শান্ত শক্তির সহিত অমরত্বে উঠিতে চাহিবে—এপথ তাহার নহে।

মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। কারণ শরীরই মরে কিন্তু শরীর মানব নহে। যাহা নিত্য বস্তু তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—তবে তাহা ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, শুধু আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তেমনই যাহা অনিত্য তাহার কোন সত্ত্বা থাকিতে পারে না। এই সৎ ও অসতের তফাৎ উপলব্ধি হইলে বুঝা যায় যে আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে—কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু যাঁহার এই দেহ, যিনি এই দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আত্মা অনন্ত, অপ্রেমেয়, নিত্য, অবিনাশী; যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে—ইহাতে শোক করিবার কি আছে? পশ্চাৎপদ হইবার বা শিহরিয়া উঠিবার কি আছে? ইহা জন্মায় না, মরেও না। ইহা এরূপ বস্তু নহে যে, উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। ইহা অজ, শাশ্বত, পুরাণ—শরীরের বিনাশ হইলেও ইহা হত হয় না। অমর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে কে পারে? শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা স্থানু, অচল, সর্ব্বব্যাপী সনাতন। ইহা শরীরাদির ন্যায় ব্যক্ত নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর

নহে—তবে ইহা সকল ব্যক্ত বস্তু অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না—তবে ইহা সকল মন অপেক্ষা বড়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার বিকার হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না—ইহা দেহ, মন, প্রাণের পরিবর্ত্তনের অতীত—তবে ইহা সেই সত্য বস্তু, এই সকল যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

যদিই ইহা সত্য হয় যে আমাদের সত্বা তত মহান নহে, তত বিরাট নহে, যদি মনে করা যায় যে আত্মা নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও দেহের সহিত মরে—তথাপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা উচিৎ নহে। কারণ আত্মার স্বপ্রকাশের জন্য জন্ম মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা থাকে না, তাহা নহে। জন্মের পূর্ব্বে আত্মা এরূপ অবস্থায় থাকে যাহা আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর, অব্যক্ত—এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হওয়া, ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃত্যুকালে আত্মা আবার সেই অব্যক্তাবস্থায় ফিরিয়া যায়, এই অবস্থা হইতে আবার তাহা ব্যক্ত হয়, বাহেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু হউক—মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের জড় ইন্দ্রিয় মনের যে শোক তাহা নিতান্ত অজ্ঞান, স্নায়বিক আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করি তখন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্য শোক করি যাহাদের জন্য শোক করিবার কোন কারণই নাই—কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায় না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয় না, বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা থাকে এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা কম সুখে থাকে না।

কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের সত্বা খুবই মহান্। সকলেই সেই আত্মা, এক ব্রহ্ম—যাঁহাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন, কেহ

আশ্চর্য্যবৎ বলেন বা আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত—আমাদের সকল জ্ঞানচর্চ্চা এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ সত্ত্বেও সেই পরব্রহ্মকে এ পর্য্যন্ত কোন মানব মনই স্বরূপতঃ জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের আড়ালে লুকায়িত রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু সমস্ত জীবন ইহারই ছায়া মাত্র। আত্মার শারীরিক মূর্ত্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর দ্বারা এই অবস্থা পরিত্যাগ—এ সকল তাঁহারই একটি সামান্য লীলা। যখন আমরা নিজদিগকে এই ভাবে জানিব তখন নিজদিগকে হন্তা বা হত বলার কোন অর্থই থাকিবে না। মানব-আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মাঝে মাঝে পরলোকে বিশ্রাম করিতেছে, আবার ইহলোকের সুখ দুঃখ, যুদ্ধ দ্বন্দ্ব, জয় পরাজয়কে উন্নতিরই সহায় করিয়া ক্রমশঃ অমরত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে—ইহা সেই পরব্রহ্মেরই লীলা, তাঁহারই অভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তাই গুরু বলিলেন—হে ভারত, এই বৃথা শোক ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধ করিবার কথা কেমন করিয়া আসিল? আমরা যদি এই উচ্চ, মহান জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, মন ও আত্মার কঠোর সংযমের দ্বারা চিত্তের আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতারণার উপরে উঠিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে অবশ্য আমরা শোক ও মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুভয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শোক দূর হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাদিগকে আমরা মৃত বলি তাহারা বাস্তবিক মরে নাই

এবং তাহাদের জন্য শোক করিবার কিছু নাই কারণ তাহারা কেবল ইহলোকই ছাড়িয়া গিয়াছে। উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলে আমরা জীবনের ভীষণ দ্বন্দ্বে অবিচলিত থাকিতে পারি এবং দেহের মৃত্যুকে তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারি। জীবনের সমস্ত ঘটনাই সেই এক ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং সেই এক ব্রহ্মের সহিত আমাদের একত্ব অনুভব করিবারই উপায় মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিতে বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে অর্জ্জুনকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাতে এই যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করাই আবশ্যক। তাঁহার স্বধর্ম্ম, তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই সংসার জড়-জগতে ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ—ইহা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশেরই ব্যাপার নহে, এখানে জীবনের বাহ্যিক ঘটনাগুলিকেও উক্ত ক্রমবিকাশের সহায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পরস্পরকে সাহায্যও করিতে হইবে; আবার পরস্পরের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে। এখানে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সহিত, সহজ সুখ ও সোয়াস্তির ভিতর দিয়া কেহই অগ্রসর হইতে পারে না—এখানে একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলেও বীরের মত চেষ্টা করিতে হয়, বাধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যাহারা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়বিধ দ্বন্দ্বেই প্রবৃত্ত হয়—এমন কি বাহ্যিক দ্বন্দ্বের চরম স্বরূপ যুদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়—তাহারাই ক্ষত্রিয়, তাহারাই বীরপুরুষ; যুদ্ধ, বল, উচ্চহৃদয়তা, সাহস তাহাদের স্বভাব; ন্যায়ের রক্ষা এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, নিশ্চিত মরণ জানিয়াও পলায়ন না করাই তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের কর্ত্তব্য। কারণ এই সংসারে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, আততায়ী ও অত্যাচারীর সহিত রক্ষাকর্ত্তার দ্বন্দ্ব

অনবরতই চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ্ব পরিণামে যখন বাহ্য যুদ্ধে আসিয়া দাঁড়ায় তখন যিনি ধর্ম্মপক্ষের নায়ক হইয়া ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার ভীষণ ও কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে কম্পিত হওয়া চলিবেই না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অনুচর ও সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করা, নিজপক্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, যুদ্ধের ভীষণতা ও নৃশংসতার জন্য ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্যের বশে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ধ্বজা ধুল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেওয়া, আততায়ীর রক্তমাখা পদে দলিত হইতে দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। যুদ্ধ পরিত্যাগ নহে, যুদ্ধ করাই তাঁহায় ধর্ম্ম, তাঁহার কর্ত্তব্য। হত্যা করিলে, নহে, হত্যা না করিলেই এখানে পাপ হইবে।

অর্জ্জুন দুঃখ করিতেছিলেন যে মানুষ যাহার জন্য, যে সকল উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে সে সকল ব্যর্থ হইবে, তাঁহার জীবন বাস্তবিক শূন্য হইয়া যাইবে। ভগবান ক্ষণিকের জন্য আর এক দিক দিয়া এই দুঃখের উত্তর দিলেন। ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সুখ কি? নিজের ও পরিবারবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা নহে, আত্মীয়বন্ধু সহ আরাম ও শান্তিসুখময় জীবন যাপন নহে—ক্ষত্রিয় জীবনের প্রধান সুখ হইতেছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবন দেওয়া অথবা যুদ্ধ জয় করিয়া বীরের মুকুট অর্জ্জন করা এবং বীরোচিত গৌরবের সহিত জীবন যাপন করা। "ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, স্বর্গের মুক্ত দ্বার স্বরূপ এইরূপ যুদ্ধ আপনা হইতেই যে সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয় তাহারাই সুখী। যদ্যপি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করা হইবে এবং তোমার পাপ সঞ্চয় করা হইবে। এইরূপ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে যাহারা তোমার সম্মান করিতেন ও

তোমার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, তাঁহারা সকলে তোমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিবেন।" ক্ষত্রিয় জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় দুঃখ আর কিছু নাই—ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ, সাহস, শক্তি, প্রভুত্ব, বীরের গৌরব, সম্মুখ যুদ্ধে মরিয়া স্বর্গলাভ—ইহাই ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। এই আদর্শকে ক্ষুন্ন করা, এই গৌরবকে কলঙ্কিত করা, বীরশ্রেষ্ঠের জীবনে এরূপ কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত দেখান এবং এইরূপে মানুষের নৈতিক জীবনের আদর্শকে ছোট করা—ইহাতে নিজের অকল্যাণ করা হয়, জগতেরও অকল্যাণ করা হয়। "যদি হত হও, স্বর্গে যাইবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে—অতএব, হে কুন্তিপুত্র! যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হও, উঠ।"

পূর্ব্বে যে সুখদুঃখে অবিচলিত থাকার কথা, ধীরতার কথা বলা হইয়াছে এবং পরেও যে গভীরতর আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হইবে, সেই দুইয়ের তুলনায় ভগবানের এই বীরোচিত অভিভাষণ খুব নিম্নস্তরের বলিয়াই মনে হয়। কারণ পরের শ্লোকেই ভগবান অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮

—"সুখ দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হও, তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।" ইহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সময়েই অধিকারী ভেদ স্বীকার করিয়াছে—মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ কার্য্যতঃ আবশ্যক। ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, চাতুর্বর্ণের আদর্শ—ভগবান ইহার সামাজিক দিকটাই

এইখানে বুঝাইয়াছেন—ইহার ভিতরে যে গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তাহা পরে দেখাইবেন। ভগবান বলিলেন, যদি তুমি সুখ দুঃখের হিসাব করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল হিসাব করিয়াই কর্ম্ম করিতে চাও তাহা হইলে মোটের উপর তোমার প্রতি ইহাই আমার উত্তর—মরিলে স্বর্গে যাইবে ইত্যাদি। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চজ্ঞান কোন্ পথ দেখায়। এখন তোমাকে বুঝাইলাম যে তোমার সামাজিক কর্ত্তব্য, তোমার বর্ণের নৈতিক আদর্শ তোমাকে কি পথ দেখায়—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য। তুমি যে দিক দিয়াই আলোচনা কর, ফল একই হইবে। কিন্তু, যদি তোমার সামাজিক কর্ত্তব্যে, তোমার বর্ণের ধর্ম্মে তুমি তৃপ্ত না হও, যদি তোমার মনে হয় যে ইহা তোমাকে দুঃখে ফেলিবে, পাপে ফেলিবে তাহা হইলে তুমি আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর, নিম্নে নামিও না। তোমার ভিতর হইতে সমস্ত অহমিকা দূর করিয়া দাও, সুখ দুঃখ তুচ্ছ কর, লাভ অলাভ ও সমস্ত পার্থিব ফলাফল তুচ্ছ কর। তোমাকে কোন্ পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, ভগবানের আদেশে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে শুধু তাহাই দেখ—“নৈবং পাপমবাপ্স্যসি” তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপে অর্জ্জুনের দুঃখের যুক্তি, হত্যা-বিমুখতার যুক্তি, পাপবোধের যুক্তি, তাহার কর্ম্মের অশুভ ফলের যুক্তি—সকল যুক্তিরই তৎকালীন আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শ অনুসারেই উত্তর দেওয়া হইল।

ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বলে—“ভগবানকে জান, নিজেকে জান, মানুষকে সাহায্য কর। ধর্ম্মকে, ন্যায়কে রক্ষা কর, ভয় ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া অবিচলিত ভাবে সংসারে তোমার যুদ্ধের কার্য্য সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মা, তোমার আত্মা

অমরত্ব লাভের পথেই সংসারে আসিয়াছে; জীবন মৃত্যু কিছু নয়, দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা কিছু নয়, কারণ এই সকলকে জয় করিতে হইবে, ইহাদের উপরে উঠিতে হইবে। তোমার নিজের সুখ, নিজের লাভের দিকে তাকাইও না, কিন্তু, উপর দিকে এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখ—উপরে ঐ যে উজ্জ্বল চূড়ার দিকে তুমি উঠিতেছ ঐদিকে দৃষ্টি রাখ, তোমার চারিদিকে এই যুদ্ধ ও পরীক্ষার ক্ষেত্র, সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ কেমন সেখানে শুভ অশুভ, উন্নতি অবনতি পরস্পরের সহিত নির্ম্মম ভাবে দ্বন্দ্ব করিতেছে। মানুষ তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে—বলিতেছে তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাহাদের সহায়, অতএব, তাহাদিগকে সাহায্য কর, যুদ্ধ কর। যদি জগতের উন্নতির জন্যই ধ্বংসকার্য্য আবশ্যক হয় তবে ধ্বংস কর—কিন্তু যাহাদিগকে ধ্বংস করিবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না, যাহারা ধ্বংস হইবে তাহাদের জন্য শোক করিও না। সকল স্থানেই সেই এক সত্য বস্তুকে জানিও—জানিও সকল আত্মাই অমর এবং এই দেহ শুধু ধূলা। শান্তি, শক্তি, সমতার সহিত তোমার কার্য্য কর। যুদ্ধ কর, বীরের মত পতিত হও কিম্বা বীরের মত জয়লাভ কর। কারণ, ভগবান এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে এই কার্য্যই সম্পাদন করিতে দিয়াছেন।"

অষ্টম অধ্যায়।

সাংখ্য ও যোগ

ভগবান অর্জ্জুনের সমস্যার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উত্তর সারিয়া প্রথমেই সাংখ্য ও যোগের প্রভেদ করিলেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ২। ৩৯

"সাংখ্যে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইয়াছে। এখন যোগে এই জ্ঞান কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ, এই জ্ঞান সহকারে যদি তুমি যোগে থাক তাহা হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।"

যে পরমার্থদর্শন গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য এই শ্লোকোক্ত প্রভেদে তাহার মূলসূত্র নিহিত রহিয়াছে এবং গীতার্থ বুঝিতে হইলে এইরূপ প্রভেদ একান্ত প্রয়োজন।

(গীতা মূলতঃ বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনটি গ্রন্থ প্রামান্য বলিয়া পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি। সত্যের উপর গীতা শিক্ষার ভিত্তি হইলেও—গীতা আপ্তবাক্য নহে, অর্থাৎ ঋষিগণের যোগদৃষ্টিতে সত্য যেরূপ প্রতিভাত—গীতায় তাহা ঠিক সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত হয় নাই, গীতার শিক্ষা বিচার, বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তির ভিতর দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি, গীতার উপর লোকের এরূপ শ্রদ্ধা যে ইহা প্রায় ত্রয়োদশ উপনিষদ বলিয়া গণ্য হয়। তবে গীতার বৈদান্তিক ভাবগুলি সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সাংখ্য ও যোগের ভাবে রঞ্জিত এবং এইরূপ সমন্বয়ই দর্শনশাস্ত্র হিসাবে গীতার বিশেষত্ব। বাস্তবিক পক্ষে গীতায়

প্রধাণতঃ যোগেরই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং কেবল এই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্তই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। (গীতা শুধুই বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচার করে নাই, কিন্তু, একদিকে যেমন জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি করিয়াছে এবং ভক্তিকেই কর্ম্মের সার ও প্রাণ বলিয়াছে তেমনিই কর্ম্মকেই আবার জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তি করিয়াছে) আবার গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ এবং বরাবর ইহার অনেকটা মত ও পদ্ধতি সাংখ্যেরই অনুরূপ। তথাপি ইহা সাংখ্যকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং এইরূপে সাংখ্যের নিম্নস্তরের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে।

তাহা হইলে, গীতায় যে সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হইয়াছে, সে গুলি কি? আমরা এখন সাংখ্য বলিতে ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এবং যোগ বলিতে পাতঞ্জলির যোগ সূত্র বুঝি—কিন্তু গীতার সাংখ্য ও যোগ যে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই! কারিকায় সাংখ্যমত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, গীতার সাংখ্য সেরূপ নহে—কারণ গীতা কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও সৃষ্টির মূল তত্ত্বস্বরূপ বহু পুরুষ স্বীকার করে না। প্রচলিত সাংখ্যের সম্পূর্ণভাবে বিপক্ষে গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে যে আত্মা এবং পুরুষ এক, সেই একই ঈশ্বর ও পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বরই এই জগতের আদি কারণ। আধুনিক ভাষায় তফাৎ করিতে গেলে—প্রচলিত সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী; কিন্তু, গীতার সাংখ্য ঈশ্বরবাদ (theism) সর্ব্বেশ্বরবাদ (pantheism) এবং একত্ববাদের (monism) সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

গীতায় যে যোগের কথা আছে তাহাও পাতঞ্জলির যোগ প্রণালী নহে। কারণ, পাতঞ্জলিতে খাঁটি রাজযোগেরই প্রণালী বিবৃত হইয়াছে—এই প্রণালীতে আভ্যন্তরীণ বৃত্তি সমূহকে সংযত করিবার বাঁধাধরা পদ্ধতি আছে, ইহাতে সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উপায় সমূহের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তকে শান্ত করিয়া সমাধির অবস্থায় তুলিতে হয়; তাহাতে ঐহিক ও চিরন্তন উভয়বিধ ফললাভ হয়। ঐহিক ফল—জীবের জ্ঞান শক্তি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। চিরন্তন ফল—ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু গীতার যোগ উদার নানামুখী, উহা বাঁধাধরা নিয়ম প্রণালীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে; উহার মধ্যে নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে এবং তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে; রাজযোগ ইহার একটি সামান্য অপ্রধান অংশ মাত্র। গীতার যোগে রাজযোগের মত কাটা ছাঁটা বৈজ্ঞানিক স্তর বিভাগ নাই—উহা আত্মার সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রণালী। কিভাবে আমরা কর্ম্ম করিব এই সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করিয়া—সমস্ত আধারের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে,—আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে পুরাতন প্রাকৃত সত্বা ও সংস্কার (প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত করিয়া অভিনব দিব্য ধর্ম্মে গড়িয়া তুলিতে হইবে; অপরা প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া পরা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহাই গীতার যোগের লক্ষ্য। অতএব, পাতঞ্জলিতে যে যৌগিক অবস্থার কথা হইয়াছে—গীতার সমাধি তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পাতঞ্জলির মতে শুধু প্রথমাবস্থাতে চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং একাগ্রতা লাভের জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু, গীতা কর্ম্মকেই যোগের বিশেষ লক্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়াছে। পাতঞ্জলির মতে কর্ম্ম শুধু যোগের উপক্রমণিকা—গীতার মতে কর্ম্মই যোগের স্থায়ী ভিত্তি। রাজযোগানুসারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইলে কর্ম্মকে বস্তুতঃ পরিত্যাগই করিতে হয় অন্ততঃ শীঘ্রই যোগের উপায় স্বরূপ কর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। গীতার মতে কর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উঠিবার একটি উপায় এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি হইবার পরও কর্ম্ম থাকে।

এতটুকু বলা দরকার, কারণ সুপরিচিত কথাগুলি প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে ভাবার্থ বুঝিতে গোলমাল হওয়া সম্ভব। তবে, প্রচলিত সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যাহা কিছু উদার, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক সত্য আছে গীতায় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—যদিও গীতা শুধু ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। উপনিষদের বৈদান্তিক সমন্বয়ে এবং পরবর্ত্তী পুরাণে আমরা যে উদার বৈদান্তিক সাংখ্যমতের পরিচয় পাই, গীতার সাংখ্য তাহাই। প্রধানতঃ অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আত্মার দর্শন ও ভগবানের সহিত মিলনের যে সাধনা তাহাই গীতার যোগ—রাজযোগ গীতার এই উদার সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ দুইটি বিভিন্ন, সামঞ্জস্যহীন, পরস্পর বিরোধী মতবাদ নহে—তাহাদের মূল নীতি ও লক্ষ্য এক। শুধু তাহাদের পদ্ধতি ও আরম্ভ বিভিন্ন। সাংখ্যও এক প্রকার যোগ—তবে ইহার আরম্ভ জ্ঞানে; অর্থাৎ সাংখ্য মতে বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব সমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং সত্যকে দর্শন করিয়া, লাভ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অপরদিকে, যোগের আরম্ভ কর্ম্মে, মূলতঃ ইহা কর্ম্মযোগ। তবে গীতার সমগ্র শিক্ষা হইতে এবং পরে কর্ম্ম শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ম্ম শব্দটী খুব বিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ক্রিয়া হইতেছে সে সমস্ত সর্ব্বকর্ম্মের

ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা, যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা ও প্রভু স্বরূপ ভগবানের নিকট সমর্পণ করা—ইহাই যোগ। জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য দেখা যায় তাহার সাধন করাই যোগ—এবং এই জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা যায় তাহার প্রতি জ্ঞানসম্ভূত ভক্তি ও শান্ত বা আবেগপূর্ণ আত্মসমর্পনই ঐ সাধনের পরিচালক শক্তি।

কিন্তু, সাংখ্যের সত্য কি? তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ ও সংখ্যা করিয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে। সাধারণতঃ আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি তাহা নানা তত্ত্বের সংযোগের ফল—সাংখ্য এই তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়াছে এবং তাহাদের গণনা করিয়াছে। সাংখ্য বিশ্লেষণ করিয়াছে বটে কিন্তু সমন্বয় করিতে মোটেই চেষ্টা করে নাই। মূলতঃ সাংখ্য দ্বৈতবাদী। বৈদান্তিকদের মধ্যে যাঁহারা নিজদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, সেরূপ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ সাংখ্যের মত নহে। সাংখ্যের মত সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত অর্থাৎ সাংখ্য সৃষ্টির মূলে একটি নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করে—নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি। তাহাদের সংযোগেই জগতের উৎপত্তি। পুরুষই আত্মা; আত্মা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় পুরুষ তাহা নহে—পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যময়, অচল অবিকারী, স্বপ্রকাশ। শক্তি এবং তাহার ক্রিয়াই প্রকৃতি। পুরুষ কিছুই করে না—শুধু শক্তি এবং তাহার ক্রিয়া পুরুষে প্রতিফলিত হয়; প্রকৃতি বস্তুতঃ জড় অচেতন হইলেও পুরুষে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জন্ম জীবন ও মৃত্যু, চৈতন্য ও অচৈতন্য, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞান, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ এই সকল ব্যাপারের উদ্ভব হয় এবং প্রকৃতির প্রভাবের

অধীন পুরুষ এই সকলকে তাহার নিজের বলিয়া ধরে কিন্তু বাস্তবিক এই সকল মোটেই পুরুষের নহে, এই সব শুধু প্রকৃতিরই ক্রিয়া।

কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—প্রকৃতির শক্তি মূলতঃ তিন প্রকার। সত্ত্ব জ্ঞানের বীজ—ইহা স্থিতি করে; রজঃ, তেজ ও কর্ম্মের বীজ—ইহা সৃষ্টি করে; তমঃ জড়তা ও অজ্ঞানের বীজ এবং সত্ত্ব ও রজেঃর বিরোধী—সত্ত্ব ও রজঃ যাহা সৃষ্টি ও স্থিতি করে, তমঃ তাহা লয় সাধন করে। যখন প্রকৃতির এই তিনটী গুণ সমান বলে বলী হইয়া সাম্যাবস্থায় থাকে—তখন সব স্থির—তখন কোন গতি, ক্রিয়া বা সৃষ্টি থাকে না; অতএব তখন অবিকারী জ্যোতির্ম্ময় চেতন আত্মায় প্রতিফলিত হইবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন এই সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখন তিনটী গুণ অসমান হইয়া পরস্পরের সহিত বিরোধ করে এবং তখন অনবরত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে—বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ব্যাপারে পুরুষের সনাতন স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। যতদিন পুরুষ ইহা চায় এবং নিজকে প্রকৃতির গুণসম্পন্ন দেখে ততদিনই এইরূপ বিচ্যুতি থাকে, এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকে। কিন্তু যখনই পুরুষ আর এ সবে সম্মতি দেয় না—তখনই গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লাভ করে, তখনই আত্মা তাহার সনাতন, অপরিণামী, অচল অবস্থায় ফিরিয়া আসে, আত্মার মুক্তি হয়। এইরূপে প্রকৃতির খেলা প্রতিবিম্বিত করা এবং সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া—শুধু এইটুকুই পুরুষের ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যের পুরুষ শুধু প্রতিফলনের জন্য দেখিতে পারে এবং অনুমতি দিতে পারে—গীতার ভাষায় সাক্ষী ও অনুমন্তা—কিন্তু ঈশ্বররূপে কর্ম্ম করে না। এমন কি পুরুষের যে অনুমতি দেওয়া বা অনুমতি প্রত্যাহার করা তাহাও ঠিক পুরুষের কার্য্য নহে—প্রকৃতিই করাইয়া দেয়। বাহ্য বা আভ্যন্তরীন কোন কর্ম্মই পুরুষের

নাই—তাহার কার্য্যকরী ইচ্ছা নাই, কার্য্যকরী বুদ্ধি নাই। অতএব শুধু পুরুষ একা এই জগতের কারণ হইতে পারে না—দ্বিতীয় কারণ দেখান আবশ্যক। জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের আধার আত্মা একা এই জগতের কর্ত্তা নহে—আত্মা ও প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় চৈতন্য এবং ক্রিয়াশীলা শক্তি এই যুগ্ম কারণ হইতেই জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য এই ভাবেই জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলে আমরা যে চিন্তা করিতেছি, বিচার করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি, সঙ্কল্প করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি এসব কোথা হইতে হয়? এগুলি ত আমাদের জীবনের কম অংশ নহে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি এগুলি প্রকৃতির নহে, এগুলি পুরুষের। সাংখ্যমতানুসারে এই বিচার বুদ্ধি ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে জড়প্রকৃতিরই অংশ—এগুলি আত্মার গুণ নহে। সাংখ্য যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে—এগুলি তাহার মধ্যে একটি তত্ত্ব—বুদ্ধি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে জড়জগতের উপাদানস্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ স্থূলভূত প্রাচীন শাস্ত্রে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী এই সকল নামে অভিহিত। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমানকালে জড়বিজ্ঞান উপাদান (elements) বলিতে যাহা বুঝে, এই পঞ্চভূত সেরূপ উপাদান নহে—ইহারা জড়শক্তির পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা এই স্থূল জড়জগতে ইহারা কোথাও খাঁটি অবস্থায় নাই। জগতের সমস্ত পদার্থই এই পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা বা উপাদানের সংমিশ্রনে গঠিত। আবার পাঁচটির প্রত্যেকটিই জড়শক্তির, একটি সূক্ষ্ম গুণের আধার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ। মন এই পাঁচ প্রকারেই বাহ্যিক জগতের বস্তু সকলকে

গ্রহণ করে। অতএব, মূল প্রকৃতি হইতেই আবির্ভূত এই পঞ্চ মহাভূত এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা—এইগুলি হইতেই বাহ্যদৃশ্য জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।

অন্য ত্রয়োদশটি তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত—বুদ্ধি বা মহৎ, অহঙ্কার মন এবং ইহার অধীনে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন আদি ইন্দ্রিয়—মনই বাহ্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে, মনই তাহাদের উপর কার্য্য করে। কারণ, মনের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুই রকম ক্রিয়াই রহিয়াছে। মন প্রত্যক্ষের দ্বারা বাহ্য স্পর্শ গ্রহণ করিয়া জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়ার জন্য শরীর যন্ত্রকে পরিচালিত করে। কিন্তু, মন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের বিশেষ করে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে গ্রহণ করে। মন সেইরূপই বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়ার বিশেষ করে। প্রকৃতির যে শক্তি বিচার করে, ভেদ ও সামঞ্জস্য নির্ণয় করে তাহারই নাম বুদ্ধি—ইহা একাধারে বোধশক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি। বুদ্ধির যে তত্ত্বের দ্বারা পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া ধরিয়া লয়, প্রকৃতির কার্য্যাবলীকে নিজের কার্য্যাবলী বলিয়া মনে করে তাহারই নাম অহঙ্কার। কিন্তু, এই সকল (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) আভ্যন্তরিক তত্ত্ব (Subjective principles) নিজেরা জড়, অচেতন—বাহ্যিক জগতের কার্য্যাবলী যেরূপ অচেতন প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্গত, ইহারাও ঠিক সেইরূপ। বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা (এই দুইকেই সাংখ্যে বুদ্ধি বলা হইয়াছে) কেমন করিয়া জড় অচেতনের ক্রিয়া হইতে পারে, নিজেরা জড় হইতে পারে ইহা বুঝিতে যদি আমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদের

স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানও (Science) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এমন কি পরমাণুর (atom) জড়ক্রিয়াতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকেও অচেতন ইচ্ছাশক্তি বলা যাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনায় ঐ সর্ব্বব্যাপী ইচ্ছা অচেতনভাবেই বুদ্ধির কার্য্য করিতেছে। জড় জগতের সকল কার্য্যে যে ভেদাভেদ নির্ণয় অচেতন ভাবে চলিতেছে—সেই ক্রিয়া এবং যাহাকে আমরা মানসিক বুদ্ধির ক্রিয়া বলি তাহা মূলতঃ একই জিনিষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল। কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড়-প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষীস্বরূপ পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়—প্রকৃতির চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা, পুরুষের নিজের বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু, বস্তুতঃ এই সব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ক্রিয়া প্রকৃতি এবং তাহার তিন গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়—মোটেই পুরুষের দ্বারা নহে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য হইতে পুরুষের মুক্তি লাভের প্রথম সোপান।

সংসারে অবশ্য অনেক জিনিষ রহিয়াছে সাংখ্য যাহা আদৌ ব্যাখ্যা করে নাই অথবা সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করে নাই। কিন্তু, আমরা যদি সৃষ্টিতত্ত্বের এমন যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তি লাভ করিতে পারে (এরূপ মুক্তিই প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য) তাহা হইলে সাংখ্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছে এবং মুক্তির যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে তাহা অন্য কিছু হইতে

কম সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যের যেটা আমরা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না সেটা হইতেছে ইহার বহুপুরুষবাদ। মনে হয় এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতি ধরিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য বস্তুতত্ত্ব যেরূপ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষমত না আনিলে আর উপায় ছিল না। প্রথমতঃ বাস্তবিক আমরা দেখি যে জগতে অনেক সচেতন জীব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই জগৎকে আপন আপন ধারা অনুসারে অবলোকন করে—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অন্যলোকের নিকট যেরূপ তাহার নিকট সেরূপ নহে—প্রত্যেকেই জগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করে, জগতের উপর স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করে। পুরুষ যদি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ থাকিত না—সকলেই জগৎকে একভাবে দেখিত, সকলেরই নিকট অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একই রূপে প্রতিভাত হইত। সকলে এক জগৎই প্রত্যক্ষ করিতেছে—কারণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যে সকল তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ গঠিত সেগুলি সকলের পক্ষে সমান। কিন্তু জগৎকে লোকে যেরূপ দেখে, জগৎ সম্বন্ধে লোকের যেরূপ ধারণা, জগতের প্রতি লোকের যেরূপ ভাব—লোকের অনুভূতি ও কর্ম্ম অসংখ্য রকমের। ("যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে একজন সুখী হইলে সকলে সুখী হইত, একজন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত। যখন এরূপ হয় না, তখন বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে" তত্ত্বসমাসবৃত্তি) এই সকল ভেদ ও বিভিন্নতা অবলোকনকারীর, প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর নহে, কারণ প্রকৃতি এক। বহু পুরুষ, বহু সাক্ষী বা দ্রষ্টা না মানিলে এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বলিতে পারা যায় বটে জীবের অহং জ্ঞানই প্রত্যেককে

প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন করিতেছে কিন্তু অহংকার প্রকৃতির সাধারণ তত্ত্ব এবং ইহা বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। কারণ শুধু অহঙ্কার পুরুষের কেবল এই ভ্রম করাইয়া দেয় যে সে প্রকৃতির সহিত এক অভিন্ন। যদি পুরুষ একমাত্র হয় তাহা হইলে সকল জীবই এক হইবে। তাহাদের বাহ্যিক আকার প্রকার যতই বিভিন্ন হউক অহংজ্ঞানে সকলেই সমান হইবে, আত্মার দৃষ্টিতে, আত্মার বাহ্যজ্ঞানে কোন প্রভেদ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, পুরুষ যদি এক হয়, সাক্ষী যদি এক হয় তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে ধারণাও একরূপ হইবে। যে প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান হইতে সাংখ্যের উৎপত্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় খাঁটি সাংখ্য বহুপুরুষ স্বীকার করিতে ন্যায়তঃ (Logically) বাধ্য। এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতির সঙ্গ হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বুঝান যাইতে পারে কিন্তু জগতে জীবের মধ্যে এত প্রভেদ কিরূপে হয় তাহা বুঝান যায় না।

বহুপুরুষ স্বীকার না করায় আরও একটি বিষম বাধা আছে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্য দর্শনেরও উদ্দেশ্য মুক্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতি পুরুষের আনন্দের জন্য যে সকল ক্রিয়া করিতেছে পুরুষ যখন তাহা হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লয় তখনই মোক্ষ লাভ হয়; কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা কথা বলিবার একটা ধারা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিষ্ক্রিয়—অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা কার্য্য কখনও পুরুষের হইতে পারে না--ইহা নিশ্চয় প্রকৃতিরই ক্রিয়া। বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে এই অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিরই ক্রিয়া। বুদ্ধির সাহায্যেই মন প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ ও সামঞ্জস্য বিচার করে, বুদ্ধি অহঙ্কারের সাহায্যে দ্রষ্টাকে প্রকৃতির

প্রত্যক্ষ ও কার্য্যের সহিত এক করিয়া দেয়। ভেদ বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন সে বুঝিতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব ভ্রম। শেষে বুদ্ধি পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রভেদ করে এবং বুঝিতে পারে যে জগতের সমস্ত ব্যাপারই গুণত্রয়ের সাম্যবস্থার বিচ্যুতি মাত্র। তখন বুদ্ধি (at once intelligence and will) যে মিথ্যার অবলম্বন হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করে—তখন পুরুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং মন যে জাগতিক লীলায় রস পায় তাহার সহিত পুরুষ আর নিজেকে যোগ করে না। পরিণামফল এই হইবে যে প্রকৃতি পুরুষের ভিতর নিজকে প্রতিফলিত করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে; কারণ, অহঙ্কারের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বুদ্ধি উদাসীন হইয়া আর প্রকৃতির কার্য্যের অনুমতির সহায় হইবে না; কাজেই, তাহার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় পড়িতে বাধ্য হইবে, জাগতিক লীলা বন্ধ হইবে, পুরুষ তাহার অচল শান্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু, যদি শুধু একটি পুরুষই থাকিত এবং এইরূপে বুদ্ধি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উদাসীন হইয়া পড়িত তাহা হইলে সমস্ত জগৎও শেষ হইত। আমরা দেখিতেছি যে এরূপ কিছুই হয় না। কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েকজন মাত্র মুক্তি লাভ করেন বা মুক্তি পথের পথিক হ'ন--তাহাতে অবশিষ্টদের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বলীলার যে শেষ হইবার কথা তাহা দূরে থাকুক তাহাদের সহিত লীলা করিতে বিশ্বপ্রকৃতির এতটুকুও অসুবিধা হয় না। বহু স্বতন্ত্র পুরুষ মানিয়া না লইলে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না। বৈদান্তিক অদ্বৈত মতানুসারে ইহার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতেছে মায়াবাদ; কিন্তু, এই মতানুসারে সমস্তই স্বপ্ন—বন্ধন ও মুক্তি দুইই মিথ্যা, মায়ার ভ্রম, বস্তুতঃ, কেহই মুক্ত হয় না, কেহই বদ্ধ হয় না। সাংখ্য

জগৎকে এইরূপে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় না—তাই সাংখ্য বেদান্তের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। এখানেও আমরা দেখিতেছি যে সাংখ্য যেরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষ স্বীকার না করিয়া আর তাহার উপায় নাই।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ লইয়াই গীতার আরম্ভ, এমন কি গীতা যে ভাবে যোগের বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে মনে হয় গীতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইহা স্বীকার করিয়াছে। প্রকৃতি, তাহার তিনগুণ এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গীতা স্বীকার করিয়াছে। সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির—পুরুষ নিষ্ক্রিয়, গীতা ইহাও মানিয়া লইয়াছে। গীতা স্বীকার করিয়াছে যে জগতে বহু চেতন জীব আছে; অহঙ্কারের নাশ, বুদ্ধির ভেদ ক্রিয়া এবং প্রকৃতির গুণত্রয়ের অতীত হওয়াই যে মুক্তির উপায় তাহা গীতা স্বীকার করিয়াছে। অর্জ্জুনকে প্রথম হইতেই যে যোগ অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে বুদ্ধিযোগ। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতর তফাৎ রহিয়াছে—গীতার মতে পুরুষ এক, পুরুষ বহু নহে। কারণ গীতা যে লিখিয়াছে আত্মা মুক্ত, চেতন, অচল, সনাতন, অক্ষর—তাহা শুধু একটি কথা ছাড়া সাংখ্যের সনাতন, নিষ্ক্রিয়, অচল, অক্ষর পুরুষের বৈদান্তিক বর্ণনা! কিন্তু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তফাৎ এই যে পুরুষ বহু নহে, পুরুষ এক। সাংখ্য বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া যে সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে—ইহাতে আবার সেই সকল সমস্যা উঠে এবং তাহাদের আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাধান প্রয়োজন হয়। গীতা বৈদান্তিক সাংখ্যের সহিত বৈদান্তিক যোগ মিলাইয়া সে সমাধান করিয়াছে।

পুরুষ সম্বন্ধে ধারণাতেই প্রথম নূতনত্ব। পুরুষের সুখের জন্য প্রকৃতি কার্য্য করে; কিন্তু, এই সুখ নির্দ্ধারিত হয় কেমন করিয়া?

টি সাংখ্যের মতে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর উদাসীন অনুমতির দ্বারাই ইহা নির্দ্ধারিত হয়। সাক্ষী উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার ও বুদ্ধির ক্রিয়ায় সায় দেয়, আবার সেইরূপ উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার হইতে বুদ্ধির প্রত্যাহারেও সায় দেয়। সে দেখে, অনুমতি দেয় এবং প্রতিফলনের দ্বারা প্রকৃতির কার্য্য ধরিয়া থাকে—সাক্ষী অনুমন্তা, ভর্ত্তা কিন্তু আর অধিক কিছু নহে। কিন্তু, গীতার পুরুষ প্রকৃতির অধিপতিও বটে—সে ঈশ্বর। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির ক্রিয়া হইলেও ইচ্ছার উৎপত্তি ও শক্তি চেতন আত্মা হইতেই—তিনিই প্রকৃতির প্রভু। ইচ্ছার বুদ্ধির কার্য্য প্রকৃতির হইলেও—পুরুষই এই বুদ্ধির উৎপত্তিস্থান—পুরুষই সক্রিয় ভাবে এই বুদ্ধির আলোক জোগাইয়া দেন। তিনি—শুধু সাক্ষী নহেন, তিনি জ্ঞাতা ও ঈশ্বর—তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অধিপতি। তিনিই প্রকৃতির ক্রিয়ার চরম কারণ, প্রকৃতির কার্য্য হইতে সংহরণেরও তিনি চরম কারণ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ অনুসারে পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই বিভিন্ন—উভয়ের সংযোগে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, গীতার সমন্বয়কারী সাংখ্য অনুসারে পুরুষ তাঁহার প্রকৃতির সহায়ে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে গীতা প্রাচীন সাংখ্যের সঙ্কীর্ণতা হইতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু, তাহা হইলে গীতা যে অক্ষর, অচল চিরমুক্ত এক আত্মার কথা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে কি? সে আত্মা অবিকার্য্য, অজ, অব্যক্ত, ব্রহ্ম—অথচ তিনিই এই সকল ব্যাপিয়া আছেন, যেন সর্ব্বমিদং ততম্। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহার সত্তার মধ্যেই ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে; তিনি অচল হইলেও তিনিই সমস্ত কর্ম্ম ও গতির কারণ ও অধীশ্বর। কিন্তু,

ইহা কেমন করিয়া হয়? জগতে যে বহু জীব রহিয়াছে তাহারই বা কি? তাহাদিগকে ত ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না—বরং বিশেষ ভাবে তাহারা ঈশ্বর নয়, অনীশ, কারণ, তাহারা গুণত্রয়ের অধীন, অহঙ্কারের, ভ্রমের অধীন! গীতা যে বলিতেছে তাহারা সকলেই এক আত্মা, তাহা হইলে এই বন্ধন, এই অধীনতা ও ভ্রম কেমন করিয়া আসিল—পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন না বলিলে কেমন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে? আর এই বহুত্বই বা কোথা হইতে? এক শরীর ও মনের ভিতর এক আত্মা মুক্তিলাভ করিতেছে অথচ সেই এক আত্মাই অন্য শরীর মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতেছে না; নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিতেছে ইহাই বা কেমন করিয়া হয়? এই সকল প্রশ্নের একটা উত্তর না দিলে চলে না।

গীতা পরে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে, তবে সেখানে এমন সব নূতন তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা বৈদান্তিক যোগের অন্তর্ভুক্ত—প্রচলিত সাংখ্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। গীতা তিনটি পুরুষের কথা অথবা পুরুষের তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছে। উপনিষদ সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় কোথাও কোথাও কেবল দুইটি পুরুষের কথা বলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপনিষদের এক শ্লোকে আছে—এক ত্রিবর্ণের অজা আছে, ত্রিগুণময়ী স্ত্রীধর্মী প্রকৃতি; ইহা সকল সময়েই সৃষ্টি করিতেছে; দুইটি অজ পুরুষ আছে, ইহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিকে ধরিয়া ভোগ করিতেছে, আর একজন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আর এক শ্লোকে তাহাদিগকে এক বৃক্ষোপরি দুইটি পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উভয়ে একত্র বদ্ধ চিরসঙ্গী;

তাহাদের মধ্যে একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছে—প্রকৃতিস্থ পুরুষ প্রকৃতির লীলা উপভোগ করিতেছে; অপরটি খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে দেখিতেছে—সে নীরব দ্রষ্টা, ভোগের মধ্যে লিপ্ত নহে। প্রথমটী যখন দ্বিতীয়টিকে দেখে এবং বুঝিতে পারে যে সকল মহত্ত্ব তাহারই তখন সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। উক্ত দুইটি শ্লোকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কিন্তু, ইহাদের মধ্যে একটি সাধারণ অর্থ নিহিত রহিয়াছে। দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি চিরকাল নীরব, মুক্ত আত্মা অথবা পুরুষ যাহার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—তিনি তৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এই জগৎকে দেখিতেছেন কিন্তু, তাহাতে লিপ্ত হইতেছে না; অপরটি প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ পুরুষ; প্রথম শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় যে দুইটি পুরুষই এক—একই চেতন জীবের দুইটি ভিন্ন অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা—কারণ, শ্লোকোক্ত অজ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন এবং তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি হইতে যাহা বুঝা যায়—প্রথম শ্লোকে তাহা পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় শ্লোকটি বুঝায় যে একই আত্মার উচ্চ ও নীচ দুই অবস্থা—উচ্চ অবস্থায় ইহা চিরকাল মুক্ত নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত;—কিন্তু, নিম্ন অবস্থায় ইহা প্রকৃতির মধ্যে বহু জীবরূপে অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ বিশেষ জীবে প্রকৃতির লীলায় বিরক্ত হইয়া সেই উচ্চ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। একই সচেতন আত্মার এইরূপ দ্বৈত অবস্থা কল্পনা করিলে সমাধানের একটা পথ হয় বটে, কিন্তু এক কি করিয়া বহু হয় তাহা বুঝা যায় না।

উপনিষদের অন্যান্য শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গীতা এই দুইটির উপর আর একটি যোগ করিয়াছে—তাহা হইতেছে পুরুষোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—নিখিল বিশ্ব তাঁহারই মহিমা। তাহা হইলে তিনটি হইল—ক্ষর,

অক্ষর, উত্তম। ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী—ক্ষর স্বভাব (স্ব-ব্রহ্ম, ভাব-উৎপত্তি ; ব্রহ্মই অংশরূপে যে জীব হন তাহাকেই স্বভাব বলে)—আত্মার সেই বহুভূত, বহু জীবরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর বলা হইয়াছে। এই পুরুষ বহু, এখানে পুরুষ ভগবানের বহুরূপ। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে—ইহা প্রকৃতিস্থ পুরুষ। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী—নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষ—ইহা ভগবানের একরূপ, প্রকৃতির সাক্ষী কিন্তু, ইহা প্রকৃতির কার্য্যে বদ্ধ নহে ; ইহা নিষ্ক্রিয় পুরুষ—প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম, পরমপুরুষই উত্তম—উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব এবং অপরিণামী একত্ব এই দুইই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার আরও মহান্ নীরবতা ও অচলতার দ্বারা তিনি * নিজেকে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন ; তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রায়ই সূচিত হইলেও—গীতাতেই ইহা প্রথমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্ম্ম চিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সর্ব্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায় ইহাই (অর্থাৎ পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এই রূপ ধারণাই) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তমবাদ নিহিত রহিয়াছে।

---

* পুরুষঃ···অক্ষরাৎ···পরাৎপরঃ—যদিও অক্ষর পরম পুরুষ তথাপি তাহা অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে, উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

গীতা শুধু সাংখ্যকৃত প্রকৃতির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকিতে সন্তুষ্ট নহে—কারণ এই বিশ্লেষণে অহঙ্কারের স্থান আছে বটে কিন্তু বহু (multiple) পুরুষের স্থান নাই। সাংখ্যে বহু পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত নহে। গীতা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলে যে ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা জীব হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ত মোট চতুর্বিংশতিটি তত্ত্ব রহিয়াছে? গীতায় ভগবান যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই—"হাঁ, সাংখ্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে ত্রিগুণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য (apparent) কার্য্যাবলী ঠিকই সেইরূপ বটে; সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে তাহাও ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্য্যতঃ এই সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা শুধু নিম্ন অপরা প্রকৃতি—ইহা ত্রিগুণময়ী, অচেতন, দৃশ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে—ইহা পরা, চেতন, দৈবী প্রকৃতি এবং এই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) হইয়াছে। নিম্ন প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহং ভাবে প্রতিভাত, উচ্চ প্রকৃতিতে তিনি এক পুরুষ। অন্য কথায় বহুত্ব সেই একেরই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আমিই এই জীবাত্মা, সৃষ্টিতে ইহা আমার আংশিক প্রকাশ, মমৈবাংশ—আমার সমস্ত শক্তি ইহাতে আছে। ইহা উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর। ইহা নিম্ন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ মনে করে এবং এইরূপে নিম্নস্তরের জীবন উপভোগ করে। ইহা প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে এবং নিজেকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে। ইহা গুণত্রয়ের উপর উঠিতে পারে এবং কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও ইহার কর্ম্ম থাকিতে পারে—আমিও এইরূপই করিয়া থাকি। ইহা পুরুষোত্তমকে

ভক্তি করিয়া এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার দৈবী প্রকৃতি উপভোগ করিতে পারে।

ইহাই গীতার বিশ্লেষণ। ইহা শুধু বাহ্যিক বিশ্বলীলায় সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির (Superconscious Nature) উত্তম রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। শুধু খাঁটি সাংখ্যের মতে কর্ম্ম ও মোক্ষ পরস্পর বিরোধী এবং ইহাদের যোগ অসম্ভব। খাঁটি অদ্বৈতবাদ অনুসারে বরাবর যোগের অঙ্গরূপে কর্ম্ম থাকিতে পারে না এবং পূর্ণ জ্ঞান, মোক্ষ ও মিলনের পর ভক্তি থাকিতে পারে না। গীতার সাংখ্যজ্ঞান এবং গীতার যোগপ্রণালী এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছে।

সাধারণের ধারণা এই যে সাংখ্যদের ও যোগীদের প্রণালীদ্বয় বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিরোধী। ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের কাঠামোর মধ্যে এই দুই দৃশ্যতঃ বিরোধী প্রণালী বা নিষ্ঠার সমন্বয় করাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সাংখ্যকেই আরম্ভ ও ভিত্তি করা হইয়াছে; কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা যোগের ভাবে অনুপ্রাণিত এবং ক্রমশঃ যোগের ভাব ও প্রণালীর উপরই অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে লোকের মনে এই দুই প্রণালীর মধ্যে কার্য্যতঃ যে প্রভেদ ছিল তাহা এই—সাংখ্যের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধিযোগের পথ; যোগের পথ কর্ম্মের পথ, কর্ম্মানুগামী বুদ্ধির রূপান্তরের পথ। এই প্রভেদ হইতেই আর একটি দ্বিতীয় প্রভেদ আপনা হইতে আইসে—সাংখ্য লোককে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ও কর্ম্মত্যাগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়; যোগের মতে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম্মের আভ্যন্তরীন তত্ত্বের সংশোধন করিতে হইবে—কর্ম্মকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে—দেবজীবন

লাভ ও মুক্তিলাভকেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য করিতে হইবে—তাহা হইলেই যোগের মতে যথেষ্ট হইবে। অথচ, দুই প্রণালীরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক—পুনর্জ্জন্ম ও সংসার অতিক্রম করা এবং জীবাত্মার সহিত পরমের মিলন। অন্ততঃ পক্ষে গীতা এইরূপ প্রভেদই বুঝাইয়াছে।

এই দ্বিবিধ বিরোধী নিষ্ঠার সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতে অর্জ্জুনের কষ্ট হইবার কারণ এই যে তৎকালে সাধারণতঃ এই দুইটির মধ্যে বিশেষ তফাৎ করা হইত। ভগবান কর্ম্ম ও বুদ্ধিযোগের সমন্বয় লইয়াই আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট—দূরেণহ্যবরংকর্ম্ম। বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সাধারণ মনোভাব এবং বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া সকল বাসনাশূন্য ব্রাহ্মীস্থিতির পবিত্রতা ও সমত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—তবেই কর্ম্ম গ্রাহ্য হইবে। কর্ম্ম মুক্তির উপায়, তবে সে কর্ম্ম এরূপ জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া চাই। অর্জ্জুন তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। ভগবান বৈদান্তিক সাংখ্যের উপযোগী তত্ত্বসমূহের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতে লাগিলেন—ইন্দ্রিয়জয়, মনোগত সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া আত্মারাম হইয়া, নীচ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উচ্চ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সকল কথাই বিশেষভাবে বলিতে লাগিলেন—যোগের কথা অতি সামান্যভাবেই বলিলেন। তাই অর্জ্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহমাপ্নুয়াম্॥৩।১,২

—হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম্ম প্রশংসা কখনও জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ; এই দুইটীর যেটি ভাল তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন যে জ্ঞান ও সন্ন্যাস সাংখ্যের পথ, কর্ম্ম যোগের পথ।

লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥৩।৩

কিন্তু, কর্ম্মযোগের সাধন ব্যতীত প্রকৃত সন্ন্যাস অসম্ভব—ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে, লাভালাভ জয়পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে আত্মা কিছুই করিতেছে না, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে—তাহা না হইলে প্রকৃত সন্ন্যাস সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পরক্ষণেই ভগবান বলিলেন যে—জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে; অতএব, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন যোগের দ্বারাই তাঁহার কর্ম্ম সংন্যস্ত হয় এবং এতাদৃশ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।

যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪।৪২

আবার অর্জ্জুনের গোলমাল লাগিল। বাসনাহীন কর্ম্ম হইতেছে যোগের মূল কথা; এবং কর্ম্মসন্ন্যাস বা ত্যাগ হইতেছে সাংখ্যের মূল কথা। এই দুইটিকেই পাশাপাশি রাখা হইয়াছে যেন তাহারা একই সাধনার অঙ্গ,

কিন্তু, উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভগবান ইতিপূর্ব্বে যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহা এই যে বাহ্যিক কর্ম্মশূন্যতার মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কর্ম্ম চলিতেছে; আবার আত্মা যেখানে নিজকে কর্ম্মী ভাবার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল কর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরে অর্পণ করে সেখানে বাহ্যিক কর্ম্মপরায়ণাতেও প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য দেখিতে হইবে। কিন্তু অর্জ্জুনের কর্ম্মপ্রবণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এই সূক্ষ্ম প্রভেদ বুঝিতে পারিল না, এই হেঁয়ালীর মত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না—তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥৫।১

"হে কৃষ্ণ, কর্ম্ম সকলের সংন্যাস উপদেশ দিয়া আবার কর্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছ; এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও।"

ভগবান ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ তাহাতে প্রভেদটি খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখান হইয়াছে এবং উভয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত না হইলেও, কোন পথে সামঞ্জস্য হইবে তাহাও দেখান হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন—

সংন্যাসং কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥৫।২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৫।৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৫।৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫।৫

"সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ (কর্ম্মানুষ্ঠান) উভয়েই মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। যিনি দ্বেষ করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী) জানিও। যেহেতু রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক বলে জ্ঞানীরা বলেন না ; সম্যকরূপে একটির অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়" কারণ, সম্যকভাবে পালন করিলে প্রত্যেকটির ভিতরেই অপরটি অঙ্গভাবে রহিয়াছে। "জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন, যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন ; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন ; কিন্তু, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাসলাভ কষ্টকর ; যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ; তাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের (অর্থাৎ সংসারে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার) আত্মা হয় ; এবং ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবদ্ধ হন না।" তিনি জানেন যে কর্ম্ম সকল তাঁহার নহে, প্রকৃতির এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি মুক্ত হন ; তিনি কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াছেন, কোন কর্ম্ম করেন না, যদিও তাঁহার ভিতর দিয়া কর্ম্ম হয়। তিনি ব্রহ্মভূত—ব্রহ্ম হন, তিনি দেখেন যে সেই এক স্বয়ম্ভু বস্তুই সর্ব্বভূত হইয়াছেন এবং তিনিও তাঁহাদের মত একজন হইয়াছেন। তিনি বুঝেন যে তাঁহাদের সকলের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিতর দিয়া বিশ্ব প্রকৃতিরই কার্য্য এবং তাঁহারও কর্ম্মসকল সেই বিশ্বক্রিয়ার অংশমাত্র।

ইহাই গীতাশিক্ষার সব নহে ; কারণ এ পর্য্যন্ত শুধু অক্ষর পুরুষ,—

অক্ষর ব্রহ্মের কথা এবং প্রকৃতির কথা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে যে এই দুই হইতেই জগৎ। কিন্তু, এপর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা, পুরুষোত্তমের কথা ভাল স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শুধু জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ই করা হইয়াছে—কিন্তু, সামান্য সঙ্কেত ভিন্ন ভক্তির কথা আরম্ভ করা হয় নাই। ভক্তিই পরম তত্ত্ব এবং পরবর্ত্তী ভাগে ভক্তিই গীতার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত শুধু এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং নিম্নতর প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে, এখনও তিন পুরুষ এবং দুই প্রকৃতির প্রভেদ করা হয় নাই। সত্য বোধ যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সম্যক অবতারণা না করিয়া যতদূর সমন্বয় করা যায় গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শুধু ততদূরই করা হইয়াছে। যখন অতঃপর এই সকল তত্ত্বের অবতারণা করা হইবে তখন এই প্রাথমিক সমন্বয়গুলিকে উঠাইয়া না দিলেও অনেক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেই হইবে।

নবম অধ্যায়

সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত।

কৃষ্ণ বলিলেন যে মোক্ষপরতা দ্বিবিধ—সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং যোগিদিগের কর্ম্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) হয়। এই যে সাংখ্যের সহিত জ্ঞানযোগকে এবং যোগের সহিত কর্ম্মমার্গকে এক করা হইল ইহা বড় মজার জিনিষ। কারণ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তৎকালে যে দার্শনিক ধারণা ও চিন্তা সকল প্রচলিত ছিল এখন তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বেদান্ত মতের ক্রমবিকাশই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। গীতা রচনার পর হইতেই এই বৈদান্তিক প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং গীতা রচনার পর মোক্ষলাভের অন্যান্য বৈদিক ব্যবহারিক প্রণালী এক রকম উঠিয়া যায়। গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেন তাহারা সাধারণতঃ সাংখ্যপ্রণালীই গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞান প্রণালীর প্রভাব নিশ্চয় খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের ন্যায়ই অনীশ্বরবাদী ও বহুবাদী বৌদ্ধমত বিশ্বশক্তির কার্য্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝোঁক দিয়াছিল; কিন্তু, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্তিকে প্রকৃতি না বলিয়া কর্ম্ম বলা হইয়াছে, কারণ বৌদ্ধেরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বীকার করে না; তাহাদের মতে বুদ্ধি যখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যতা বুঝিতে পারে তখনই মুক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল

তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনর্প্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত বেদান্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার স্থানে বেদান্তানুমোদিত ভ্রম, মায়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, নির্ব্বাণবাদের স্থানে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের (ব্রহ্ম, মায়া, মোক্ষ) উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্কর যে সাধন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংসার মিথ্যা বলিয়া সংসার ত্যাগের যে উপদেশ দিয়াছেন বর্ত্তমানে আমরা জ্ঞানযোগ বলিতে সাধারণতঃ সেইটাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু, যখন গীতা রচিত হয় তখনও মায়াবাদ বেদান্তদর্শনের মূল কথা বলিয়া গণ্য হয় নাই এবং পরবর্ত্তী কালে শঙ্কর এই মায়াবাদকে যেরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন গীতা রচনার সময় মায়া শব্দের অর্থ সেরূপ স্পষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ, গীতাতে মায়ার কথা খুব অল্পই আছে কিন্তু প্রকৃতির কথা অনেক আছে। মায়া শব্দ প্রকৃতি শব্দের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে বরং প্রকৃতির যে নিম্নাবস্থা—অপরা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইয়াছে—ত্রৈগুণ্য-ময়ী মায়া। গীতার মতে ভ্রমাত্মিকা মায়া নহে, প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

তবে, দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক প্রভেদ যাহাই থাকুক, গীতা সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কার্য্যতঃ যেরূপ প্রভেদ করিয়াছে বর্ত্তমানের বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ এবং বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ এবং কার্য্যতঃ এই প্রভেদের ফলও একই রকম। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগের ন্যায় সাংখ্যও বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইত। বিচার বুদ্ধির

* পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ সাংখ্যভাবে পরিপূর্ণ, যদিও সেগুলি বৈদান্তিক ভাবেরই অধীন এবং অন্যান্য ভাবের সহিত মিশ্রিত।

সাহায্যে আত্মার স্বরূপজ্ঞান এবং জগৎ মিথ্যা জ্ঞান যেমন বেদান্তের প্রণালী তেমনই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, পুরুষ প্রকৃতিভেদের সম্যক জ্ঞান সাংখ্যেরও প্রণালী। সাংখ্য যেমন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চাহিত যে আসক্তি ও অহঙ্কার বশে প্রকৃতির কার্য্যাবলী পুরুষের উপর আরোপিত হয় বেদান্তও তেমনই বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চায় যে মানসিক ভ্রম হইতে উত্থিত অহঙ্কার ও আসক্তির বশে জাগতিক আভাষ ব্রহ্মের উপর আরোপিত হয়। বৈদান্তিক প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন নিজের সত্য সনাতন একব্রহ্ম স্বরূপে ফিরিয়া আসে তখন মায়ার শেষ হয়, বিশ্বলীলা লোপ পায়; সাংখ্য প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন তাহার নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বরূপ সত্য সনাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন গুণ:সকলের ক্রিয়া শান্ত হয়, বিশ্বক্রিয়া বন্ধ হয়। মায়াবাদীদের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়—সাংখ্যদের পুরুষও তদ্রূপ। অতএব, উভয়ের মতেই সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন ভিন্ন মোক্ষলাভের আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু, গীতার যোগ এবং বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ উভয় মতানুসারেই কর্ম্ম শুধু মোক্ষের সহায় নহে—কর্ম্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইতে পারে; এবং এই কথারই যুক্তিযুক্ততা গীতা জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বৌদ্ধধর্ম্মের * প্রবল বন্যায় গীতার এই

* আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রথমতঃ জ্ঞানী কর্ম্মহীন শান্ত সাধু-সন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম ছিল; ক্রমে যে উহা ধ্যানযুক্ত ভক্তি এবং জীবসেবা ও দয়ার ধর্ম্ম হইয়া এসিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—বোধ হয় গীতার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের সেই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান পায় নাই। পরে কঠোর মায়াবাদের তীব্রতায় এবং সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের ভাবাবেগে গীতার এই কর্ম্মশিক্ষা লোপ পাইয়াছিল। কেবল এতদিন পরে সেই শিক্ষা এখন ভারতবাসীর মনের উপর প্রকৃত কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্যাগ চাইই; কিন্তু ভিতরে বাসনা ও অহঙ্কার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ ব্যতীত বাহ্যিক কর্ম্ম ত্যাগ মিথ্যাচার এবং ব্যর্থ। এই ত্যাগ যেখানে আছে সেখানে বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, তবে তাহা নিষিদ্ধও নহে। জ্ঞান চাইই, মুক্তির জন্য ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর কিছুই নাই, তবে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে; কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলনের দ্বারা আত্মা শুধু কর্ম্মশূন্য শান্তির অবস্থায় নহে, ভীষণ কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ভক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, কিন্তু, ভক্তির সহিত কর্ম্মও প্রয়োজনীয়; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্ব্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে। ইহাই গীতার সমন্বয়।

কিন্তু, সাংখ্যানুমোদিত জ্ঞানের পথ এবং যোগানুমোদিত কর্ম্মের পথ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদের সামঞ্জস্য যেমন গীতাকে করিতে হইয়াছে তেমনিই বেদান্তের মধ্যেই ঐরূপ আর একটি যে বিরোধ আছে আর্য্য জ্ঞানের উদার ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে সেই বিরোধেরও আলোচনা ও সমাধান করিতে হইয়াছে। এই বিরোধ হইতেছে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া; এক চিন্তাধারার পরিণতি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে, বেদবাদে, আর এক ধারার পরিণতি উত্তর মীমাংসা দর্শনে, ব্রহ্মবাদে; একদল লোক প্রাচীন

কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক যজ্ঞের উপর ঝোঁক দিতেন, অপর দল এই সকলকে নিম্নজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উপনিষদ হইতে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া যায় তাহারই উপর ঝোঁক দিতেন। ধন, পুত্র, জয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখ এবং পরলোকে অমরত্ব এই সকল লাভের উদ্দেশ্যে নিখুঁত ভাবে বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পন্ন করা এবং বৈদিক মন্ত্রাদি প্রয়োগ করা—বেদবাদীগণ ইহাকেই ঋষিগণের আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে ইহার দ্বারা মানুষ পরমার্থের জন্য তৈয়ারী হইতে পারে বটে কিন্তু, ইহাই পরমার্থ নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের আলয় প্রকৃত অমরত্ব দিতে পারে—এই আনন্দ সকল প্রকার ঐহিক ভোগসুখ এবং নিম্ন স্বর্গের বহু উপরে। মানুষ যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ফিরে তখনই তাহার পুরুষার্থ সাধনের, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের আরম্ভ হয়। পুরাকালে বেদের প্রকৃত অর্থ যাহাই থাকুক এই প্রভেদই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং সেইজন্যই গীতাকে ইহার আলোচনা করিতে হইয়াছে।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিতে গীতা প্রথমেই বেদবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

২।৪২,৪৩

—"বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট (তাৎপর্য্য বিমূঢ়) ইহা ভিন্ন ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্য আর কিছুই নাই এইরূপ মতের পোষক, কামাত্মা স্বর্গাভিলাষী,

মূঢ়গণ এই যে পুষ্পিত বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে তাহা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বিশিষ্ট এবং ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত।” যদিও এখন কার্য্যতঃ বেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে তথাপি ভারতবাসীরা এখনও মনে করে যে বেদ অতি পবিত্র, অনতিক্রমনীয়—সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের বেদই মূল এবং প্রামাণ্য। গীতা এই বেদকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান্। ২।৪৫

—“হে অর্জ্জুন, গুণত্রয়ের কার্য্যই বেদের বিষয়; কিন্তু, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।”

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ২।৪৬

“সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু প্রয়োজন, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও ততটুকু প্রয়োজন।” “সর্ব্বেষু বেদেষু”—সমস্ত বেদ বলিতে উপনিষদ পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়—কারণ পরে ব্যাপক শ্রুতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যিনি পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট সমস্ত বেদই নিষ্প্রয়োজন। বরং বেদগুলি বাধাস্বরূপ। কারণ, তাহাদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে এবং তাহাদের যে নানাবিধ বিরোধী ভাষ্য ও ব্যখ্যা হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে; ভিতরে জ্ঞানের আলোক না থাকিলে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, যোগে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

২।৫২, ৫৩

—"যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত শাস্ত্র সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে। শ্রুতি শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থিরা থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।" বেদের প্রতি এই সকল আক্রমণ সাধারণ ধর্ম্মভাবের এত বিরুদ্ধ যে উক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত অর্থ করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকগুলির অর্থ স্পষ্ট এবং প্রথম হইতে জ্ঞানকে বলা হইয়াছে যে উহা বেদ ও উপনিষদের উপরে—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।

যাহা হউক এই বিষয়টি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ গীতার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক, সমন্বয়কারী শাস্ত্র আর্য্য সভ্যতার এই সকল বিশিষ্ট অংশকে কখনও সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যোগদর্শনানুসারে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি এবং সাংখ্যদর্শনানুসারে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি এই উভয় মতের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে মিশাইতে হইবে। আবার পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মত এক; বেদান্ত কিন্তু উপনিষদের পুরুষ, দেব, ঈশ্বর, এই সকল তত্ত্বকে এক অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত করিয়াছে; ইহাদের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে; যোগমতানুযায়ী ঈশ্বর তত্ত্বেরও স্থান করিতে হইবে। ইহার সহিত গীতার নিজস্ব তত্ত্ব—তিন পুরুষ ও

পুরুষোত্তমের কথাও বলিতে হইবে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বের কোন প্রমাণ উপনিষদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না, যদিও এই ভাবধারা সেখানে আছে। বরং মনে হয় এই তত্ত্ব শ্রুতির বিরোধী কারণ শ্রুতি কেবল দুইটি পুরুষ স্বীকার করিয়াছে। আবার জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইলে শুধু সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে বিরোধ ধরিলেই চলিবে না, বেদান্তের মধ্যেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য ও যোগের বিরোধ হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই বিরোধেরও একটা হিসাব লওয়া প্রয়োজন। বেদ এবং উপনিষদকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এত বিরুদ্ধ দর্শন ও মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে গীতা যে বলিয়াছে শ্রুতি মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এখনও শাস্ত্রবাক্যের অর্থ লইয়া কত ঝগড়া করিতেছে এবং কত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে! এটা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয় যে বুদ্ধি বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিবে, গন্তাসি নির্ব্বেদম্, নূতন পুরাতন, শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, কোন শাস্ত্র বাক্যই আর শুনিতে চাহিবে না এবং নিজের মধ্যে যাইয়া গভীর, আভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের আলোকে সত্য আবিষ্কার করিতে চাহিবে।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের সমন্বয়ের প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, প্রথমেই গীতা দেখিয়াছে যে বৈদান্তিকদের ভাষায় কর্ম্ম শব্দের এক বিশেষ অর্থ আছে; তাঁহারা কর্ম্ম শব্দে বৈদিক যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান সমূহ বুঝিয়া থাকেন। বড় জোর গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী সংসার ধর্ম্মপালন ও ঐ সকল যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান কর্ম্মের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। ক্রিয়াবিশেষবহুল বিধি সঙ্গত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই বৈদান্তিকেরা কর্ম্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, যোগশাস্ত্রে কর্ম্ম-

শব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক। গীতা এই ব্যাপক অর্থের উপরই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছে; ধর্ম্মকর্ম্মের ভিতর আমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মাদি, সকল কর্ম্মই ধরিতে হইবে। তথাপি গীতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই, বরং যজ্ঞের ধারণাকে উন্নীত ও প্রশস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক গীতার বক্তব্যের মর্ম্ম এই—যজ্ঞ যে জীবনের সর্ব্বপ্রধান অংশ শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জীবনকেই যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে; তবে অজ্ঞানীরা উচ্চজ্ঞান ব্যতীতই ইহা সম্পাদন করে এবং যাহারা বিশেষ অজ্ঞানী তাহারা যেরূপ করা উচিত সেরূপে না করিয়া অবিধিপূর্ব্বক ইহা করিয়া থাকে। যজ্ঞ না হইলে জীবন চলিতে পারে না; সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজা সৃষ্টি করিবার সময় যজ্ঞকে তাহাদের চির সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন,—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা। কিন্তু, বেদবাদীদের যে যজ্ঞ তাহা ফল-কামনা প্রসূত; ভোগৈশ্বর্য্যই সে যজ্ঞের লক্ষ্য ও স্বর্গের অধিকতর ভোগই সেখানে শ্রেষ্ঠ গতি এবং অমৃতত্ব বলিয়া বিবেচিত। এরূপ যজ্ঞ প্রণালী কখনও গীতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে না; কারণ কামনা পরিত্যাগই গীতার প্রথম কথা—আত্মার শত্রু স্বরূপ এই কামনাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, বিনাশ করিতে হইবে এই কথা লইয়াই গীতা শিক্ষার আরম্ভ। গীতা বলে না যে বৈদিক যজ্ঞ প্রণালী নিরর্থক; গীতা স্বীকার করে যে এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে লোকে এখানে ও স্বর্গে সুখভোগ করিতে পারে। ভগবান বলিয়াছেন, অহংহি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ, লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করে আমিই সেই সেই দেবতারূপে সমুদয় যজ্ঞার্পণ গ্রহণ করি এবং তদনুযায়ী ফল আমিই প্রদান করি। কিন্তু, প্রকৃত পথ ইহা নহে; স্বর্গসুখভোগও মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে, মোক্ষ নহে। অজ্ঞানীরাই দেবতার পূজা করে, তাহারা জানে না যে এই সকল

দেবমূর্ত্তিতে অজ্ঞানে তাহারা কাহার পূজা করিতেছে; কারণ, তাহারা না জানিয়াও সেই এক ঈশ্বর, সেই এক দেবেরই আরাধনা করে এবং তিনিই সকল পূজা গ্রহণ করেন। সেই ঈশ্বরকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে; জীবনের সমস্ত কার্য্য যখন ভক্তির সহিত বাসনা শূন্য হইয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে সর্ব্বজনহিতের জন্য করা যায় তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ! বেদবাদ এই সত্যকে ঢাকিয়া দেয় এবং ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের দ্বারা মানুষকে ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে চায় সেই জন্যই বেদবাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে এবং রূঢ়ভাবেই বেদবাদকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যে মূল কথা তাহা নষ্ট করা হয় নাই; ইহাকে পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের, মোক্ষ লাভ প্রণালীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ করিয়া তোলা হইয়াছে।

বৈদান্তিকদের ভাষায় জ্ঞান শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা লইয়া এত গোলমাল নাই। গীতা প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাংখ্যদের শান্ত অক্ষর কিন্তু বহু পুরুষের পরিবর্ত্তে বৈদান্তিকদের একমেবাদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী শান্ত অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ছয় অধ্যায়ে গীতা বরাবরই স্বীকার করিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব, যদিও গীতা বরাবরই বলিয়াছে যে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানেরই একটি মূল উপাদান। সেই রকমই গীতা স্বীকার করিয়াছে যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত সমতার মধ্যে অহং তত্ত্বের নির্ব্বাণ মোক্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়; সাংখ্যমতে প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় অক্ষর পুরুষের স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন এবং এই নির্ব্বাণকে গীতা কার্য্যতঃ একই করিয়া দিয়াছে। কোন কোন উপনিষদ (বিশেষ

করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ) সাংখ্যের সহিত বেদান্তের ভাষাকে মিশাইয়া যেমন এক করিয়াছে, গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বৈদান্তিক মতের একটা দোষ আছে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। আমরা আন্দাজ করিতে পারি যে তখনও বেদান্ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণবযুগের ন্যায় ঈশ্বরবাদের (theism) বিকাশ করে নাই, যদিও ইহার বীজ উপনিষদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে গোঁড়া বেদান্তের ভিত্তি ছিল সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং তাহার চূড়া ছিল অদ্বৈতবাদ *। ইহা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই জানিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিত। কিন্তু সেই পরব্রহ্মই যে এক ঈশ্বর, পুরুষ দেব এই ধারণার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছিল ; খাঁটি ব্রহ্মবাদে এই সকল শব্দ ব্রহ্মের নিম্নতর অবস্থাতেই প্রযুজ্য হইতে পারিত। গীতা যে এই সকল শব্দ এবং অর্থকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে পরমাবস্থায় ব্রহ্মই পুরুষ এবং পুরুষের অপরা প্রকৃতিই ব্রহ্মের মায়া ; এবং সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত যোগের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে নিম্নাবস্থায় নহে, পরমাবস্থায় ব্রহ্মই ঈশ্বর। কিন্তু, গীতা ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে শান্ত অক্ষর ব্রহ্মেরও উপর স্থান দিতে অগ্রসর, নির্গুণ

---

* ঈশ্বর এবং জগতে যাহা কিছু আছে সে সবই এক—এই মতই সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) ; অদ্বৈতবাদ (Monism) বলে যে একমাত্র ভগবান বা ব্রহ্মই সত্য, আর এই জগৎ মিথ্যা, অথবা জগৎ ব্রহ্মেরই আংশিক বিকাশ।

ব্রহ্মে অহং তত্ত্বের লয় পুরুষোত্তমের সহিত চরম মিলনের একটি প্রধান প্রাথমিক প্রক্রিয়া মাত্র। কারণ পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম। অতএব গীতা বেদ ও উপনিষদের প্রচলিত শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া নিজে তাহাদের মধ্য হইতে যে শিক্ষা উদ্ধার করিয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণতঃ বেদ ও উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে গীতার সহিত তাহার মিল না হইতে পারে *। বাস্তবিক শাস্ত্রবাক্যের এরূপ স্বাধীন সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা না করিলে তৎকালে প্রচলিত অসংখ্য মতবাদের ও বৈদিক প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন কিছুতেই সম্ভব হইত না।

পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে গীতা বেদ এবং উপনিষদকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ ভাগবৎ শাস্ত্র, ভগবানের বাণী। স্বয়ং ভগবানই বেদের জ্ঞাতা এবং বেদান্তের প্রণেতা—বেদবিৎ বেদান্তকৃৎ। সকল বেদে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়—সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ। এই ভাষা হইতে বুঝা যায় যে বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞানের গ্রন্থ—এই সকল শাস্ত্রের নাম উপযুক্তই হইয়াছে। পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তাঁহার উচ্চ অবস্থা হইতে নিজেকে জগতে এবং বেদে ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

---

* বাস্তবিক পুরুষোত্তমের ধারণা গীতার পূর্ব্বে উপনিষদের মধ্যেই সূচিত হইয়াছিল; তবে, সেখানে ইহা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। গীতার ন্যায় উপনিষদেও বার বার বলা হইয়াছে যে সেই পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের মধ্যেই নির্গুণ ও গুণী ব্রহ্মের বিরোধ রহিয়াছে। এই দুইটি আমাদের নিকট বিরোধী মনে হইলেও পরম ব্রহ্ম শুধু গুণীও নহেন, শুধু নির্গুণও নহেন, তাঁহার ভিতর দুইই রহিয়াছে।

তথাপি বেদের শব্দার্থ লইয়া অনেক গোলমাল হয়—যাহারা কথার উপর অত্যধিক ঝোঁক দেয় তাহারা প্রকৃত গূঢ় অর্থের সন্ধান পায় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে শব্দে সর্ব্বনাশ, অর্থেই রক্ষা—"the letter killeth and it is the spirit that saves" এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপযোগিতারও একটা সীমা আছে। হৃদয়ের মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তিনিই সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্—" ১৫।১৫

—"আমি সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান।"

শাস্ত্র সেই অন্তরস্থিত বেদের সেই স্বপ্রকাশ সত্যের বাঙ্ময় রূপ মাত্র—ইহা শব্দব্রহ্ম। বেদে কথিত হইয়াছে যে হৃদয় হইতে, যেখানে সত্যের আবাস সেই গুহ্যস্থান হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি, সদনাৎ ঋতস্য, গুহ্যম্। উৎপত্তিস্থান এইরূপ বলিয়াই ইহার সার্থকতা; তথাপি শব্দ অপেক্ষা সনাতন সত্য বড়। এবং কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায় না যে তাহাই সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট এবং তাহা ছাড়া আর কোন সত্যই গ্রাহ্য হইতে পারে না (বেদ সম্বন্ধে বেদবাদীদের এই রূপই অভিমত—নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ)। জগতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তাহাদের দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে এইভাবেই দেখিতে হইবে। জগতে যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে বা ছিল—বাইবেল, কোরাণ, চীনদেশীয় গ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, গীতা, ঋষিদের, পণ্ডিতদের, অবতারদের বাণী ও উপদেশবাক্য—সব ধরিলেও বলিতে পার না যে আর কিছুই নাই, তোমার বুদ্ধি সেখানে যে সত্যের সন্ধান পায় না তাহা সত্য নহে

কারণ তোমার বুদ্ধি সেখানে তাহা পাইতেছে না। যাহাদের চিন্তা সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ, তাহারাই এরূপ ভুল করিবে—যাহাদের ভগবৎ অনুভূতি হইয়াছে, যাহাদের মন মুক্ত এবং আলোকসম্পন্ন তাঁহারা সত্যের সন্ধান করিতে এরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন না। যে সত্য হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথবা যাহা হৃদয়স্থিত সর্ব্ব জ্ঞানের ঈশ্বর, সনাতন বেদবিদের নিকট হইতে শুনা গিয়াছে তাহা শ্রুতই হউক, আর অশ্রুতই হউক—তাহাই প্রকৃত সত্য।

দশম অধ্যায়

বুদ্ধি যোগ

শেষ দুইটী প্রবন্ধে আমি একটু অবান্তর ভাবেই দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা মোটেই গভীর বা যথেষ্ট নহে। গীতার যে বিশেষ পদ্ধতি তাহা বুঝানই উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য। গীতা প্রথমে একটি আংশিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহার গূঢ়তম অর্থ সম্বন্ধে সংযতভাবে দুই একটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে। তাহার পর গীতা ফিরিয়া আসিয়া এই ইঙ্গিতগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়াছে এবং ক্রমে তাহার শেষ মহান্ বক্তব্যে উঠিয়াছে। এই শেষ কথাই শ্রেষ্ঠ রহস্য, গীতা মোটেই ইহা ব্যাখ্যা করে নাই, জীবনে অনুভব করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রেম, আত্মসমর্পণ ও উল্লাসের মহান্ তরঙ্গের মধ্যে ইহা জীবনে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমন্বয়ের দিকে সকল সময়েই গীতার দৃষ্টি এবং গীতার সকল কথাই সেই শেষ মহান্ সিদ্ধান্তের আয়োজন মাত্র।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমায় বলিলাম, এখন কর্ম্মযোগ বিষয়ে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবন কর (২।৩৯)। তুমি তোমার কর্ম্মের ফল ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, তুমি অন্যরূপ ফল কামনা করিতেছ এবং সেই ফলের সম্ভাবনা না দেখিয়া তুমি কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল সম্বন্ধে এরূপ ধারণা—ফল কামনাতেই কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্ম শুধু বাসনা তৃপ্তিরই উপায় এরূপ ভাব

অজ্ঞানীদের বন্ধনের কারণ। এরূপ অজ্ঞানীরা জানে না যে কর্ম্ম কি, কর্ম্মের প্রকৃত উৎপত্তি কোথায়, কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং মহৎ উপযোগিতা কি। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহার দ্বারা তুমি আত্মার সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। তুমি অনেক জিনিষকেই ভয় করিতেছ—তুমি পাপকে ভয় করিতেছ, দুঃখকে ভয় করিতেছ, নরক ও শাস্তিকে ভয় করিতেছ, ভগবানকে ভয় করিতেছ, ইহকালকে ভয় করিতেছ, পরকালকে ভয় করিতেছ, তুমি নিজে নিজেকেই ভয় করিতেছ। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, জগতের শ্রেষ্ঠ বীর হইয়া ভয় পাইতেছ না কিসে? কিন্তু, যে মহাভয় মানুষের মনকে আক্রমণ করে তাহাই এই—পাপের ভয়, ইহকালে পরকালে দুঃখের ভয়, যে সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ সেই সংসারের ভয়, যে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ সে দেখে নাই এবং যাহার বিশ্বলীলার গূঢ় রহস্য সে বুঝে না সেই ভগবানের ভয়। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহা তোমাকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং ইহার অতি স্বল্পমাত্রাও তোমাকে মুক্তি আনিয়া দিবে—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। একবার তুমি এই পথে যাত্রা করিলেই বুঝিবে যে একটি পদক্ষেপও বৃথা যায় না; প্রত্যেক সামান্য গতিতেই কিছু লাভ হইবে; তুমি দেখিবে এমন কোন বাধাই নাই যাহা তোমার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে। ভগবান এই যে এত বড় প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে সকল ভয়গ্রস্ত ইতস্ততঃকারী মানুষ জীবনে পদে পদে বাধা পাইয়াছে, ঠকিয়াছে তাহারা সহসা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না; ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার উদার অর্থও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যদি না গীতার বাণীর এই প্রথম কথাগুলির সঙ্গে আমরা সেই শেষ কথাগুলিও স্মরণ করি—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮।৬৬ ৬৬

ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ পুর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

কিন্তু, মানুষের প্রতি ভগবানের এই গভীর মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রথমেই বলা হয় নাই। পথের জন্য যতটুকু আলোর প্রয়োজন প্রথমে শুধু ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে। এই আলো আত্মার উপর নহে, বুদ্ধির উপরেই ফেলা হইয়াছে। ভগবান প্রথমে মানুষের সুহৃদ ও প্রণয়ীরূপে কথা বলিলেন না—গুরু ও পথপ্রদর্শকরূপেই এমন কথা বলিলেন যেন তাহার প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে, সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাহার কার্য্যের প্রকৃত উৎপত্তি ও মূল সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায়। কারণ, মানুষ অজ্ঞানের সহিত, ভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং সেই জন্যই ভ্রান্ত ইচ্ছারও সহিত কার্য্য করে বলিয়া মানুষ তাহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় অথবা বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; নতুবা মুক্ত আত্মার নিকট কর্ম্ম বন্ধন হয় না। এই ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই মানুষের আশা ও ভয় হয়, ক্রোধ, শোক এবং ক্ষণস্থায়ী হর্ষ হয়; নতুবা সম্পূর্ণ শান্তি ও মুক্তির সহিত কর্ম্ম করা সম্ভব। এতএব অর্জ্জুনকে প্রথমেই বুদ্ধিযোগের পরামর্শ দেওয়া হইল। অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত, এবং সেই জন্যই অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত, অনন্যচিত্ত হইয়া, সর্ব্বভূতে এক আত্মা জানিয়া আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য্য করা, অনন্ত কামনার বশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করা—ইহাই বুদ্ধিযোগ।

গীতা বলে মানুষের দুই প্রকার [illegible] তেমন প্রকার বুদ্ধি

ব্যবস্থিত, এক, সম, কেবল মাত্র সত্যই ইহার লক্ষ্য। দ্বিতীয় প্রকারের বুদ্ধিতে কোন একটি ইচ্ছা নাই, কোন নিশ্চয়াত্মিকতা নাই—জীবনে যত প্রকার কামনা আছে তাহার দ্বারাই উহা ইতস্ততঃ চালিত হয়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥২।৪১

বুদ্ধি শব্দটি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইতেছে মনের বোধ শক্তি—কিন্তু, গীতায় ইহা বিস্তৃত দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিচার করি এবং নির্দ্ধারণ করি যে আমাদের চিন্তা কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম্ম কিরূপ হইবে—সেই সমগ্র ক্রিয়াকেই গীতাতে বুদ্ধি বলা হইয়াছে; চিন্তা (thought) বুদ্ধি (intelligence) বিচার (judgement) প্রত্যক্ষ নির্দ্ধারণ (perceptive choice) এবং লক্ষ্যস্থির (aim) এই সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; কারণ, শুধু জ্ঞানলাভ ব্যাপারে মনের নিশ্চয়াত্মিকতাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ নহে কিন্তু, কর্ম্মের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ এবং সেই নির্দ্ধারণেই অবিচলিত থাকা, ব্যবসায়, বিশেষ করিয়া ইহাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ; অন্যদিকে, চিন্তার বিক্ষিপ্ততা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে—যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার" পশ্চাতে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় বিশেষ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত। অতএব, ইচ্ছা (will) এবং জ্ঞান (knowledge) এই দুইটিই বুদ্ধির * ক্রিয়া। ব্যবসায়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি—আত্মার আলোকে নিবদ্ধ, ইহা আভ্যন্তরীন আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত অন্যদিকে

* শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধি শব্দের ইংরাজী অনুবাদে বলিয়াছেন—intelligent will—অনুবাদক।

ব্যবসায়ীদের অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত বুদ্ধি—যেটি একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটিকেই ভুলিয়া চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হয়, বাহ্য জীবনের কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলে "শতখানে ধায়, শত স্বার্থের মাঝখানে।" ভগবান বলিয়াছেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ ॥২।৪৯

—"হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট; অতএব, তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর; যাহারা কর্ম্মফলের চিন্তা করে, ফলের উদ্দেশ্যে কার্য্য করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি।"

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্য মনস্তত্ত্বের যে পারম্পর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে। একদিকে পুরুষ শান্ত আত্মা, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর, এক, অপরিণামি, অন্য দিকে প্রকৃতি সচেতন পুরুষকে ছাড়া নিষ্ক্রিয় (inert) কিন্তু সচেতন পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই ক্রিয়াশীলা, প্রকৃতি নিরবয়ব (indeterminate), ত্রিগুণময়ী, সৃষ্টি ও প্রলয়ে সমর্থা। আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সে সমুদয় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন। আমাদের কাছে যেটা ভিতরের (subjective) সেইটিই প্রথমে [illegible] হয়, কারণ আত্মচেতনাই প্রথম কারণ—অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি [illegible] কারণ এবং ইহা প্রথমের অধীন। কিন্তু, তাহা হইলেও আমাদের অন্তর্জগতের বৃত্তিসমূহ প্রকৃতিই সরবরাহ করে। যথাক্রমে প্রথমে আসে বুদ্ধি ও তাহার অধীন অহঙ্কার। সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় মন (sense-mind); যে শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গ্রহণ করা হয় তাহাই এই। সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থায়

মন হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। তাহার পর উৎপন্ন হয় প্রত্যেক বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি—শব্দ রূপ, গন্ধ ইত্যাদি এবং ইহাদের ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চভূত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতের বিভিন্ন মিশ্রনের ফলে এই বাহ্য জগতের বস্তু সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাকৃতিক শক্তির এই সকল ভিন্ন ক্রম ও শক্তি সমূহ পুরুষের শুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া আমাদের অশুদ্ধ অন্তঃকরণের উপাদান হয়—অশুদ্ধ, কারণ ইহার ক্রিয়া বাহ্যজগতের প্রত্যক্ষ সমূহের উপর এবং তাহাদের আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণ বুদ্ধি ও মন এবং ইহাদের প্রত্যক্ষ, আবেগ ও বাসনা লইয়াই আমাদের অন্তঃকরণ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত বাহ্যজগতের যোগ করাইয়া দেয়। বাকী পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়ের বিষয়—ইহাদিগকে লইয়াই বাহ্য জগৎ।

সৃষ্টির যে ক্রম, যে পারম্পর্য্য দেখাইলাম বাহ্যজগতে ইহার উল্টা দেখা যায় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু, যদি আমরা স্মরণ রাখি যে বুদ্ধি নিজেই অচেতন প্রকৃতির জড়ক্রিয়া মাত্র এবং জড় অনুতেও এরূপ অচেতন বোধ শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে—যদি বৃক্ষলতায় আমরা সুখদুঃখ বোধ, স্মৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতির সূচনা দেখিতে পাই, যদি দেখি যে প্রকৃতির এই সকল শক্তিই অন্যান্য জীব ও মনুষ্যের চৈতন্যের ক্রমবিকাশে অন্তঃকরণ হইয়াছে তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান জড়-জগতের পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সাংখ্য প্রণালীর সহিত তাহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষের অবস্থায় ফিরিয়া যায় তখন প্রকৃতির আদি অভিব্যক্তির উল্টা ক্রম

অবলম্বন করিতে হয়। উপনিষদে আত্মশক্তির ক্রমবিকাশের এইরূপ ক্রমই দেখান হইয়াছে এবং গীতা এ বিষয়ে উপনিষদকেই অনুসরণ করিয়াছে, প্রায় উপনিষদের বাক্যই অবলম্বন করিয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৩ ৪২

"ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি"—সেই চৈতন্যময় আত্মা, পুরুষ। তাই, গীতা বলিয়াছে যে এই পুরুষকে, আমাদের অন্তর্জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কারণকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে; তাহাতেই আমাদের ইচ্ছা ন্যস্ত করিতে হইবে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৩।৪৩

এইরূপে আমাদের নিম্ন প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ প্রকৃত চেতন আত্মার দ্বারা নিশ্চল করিয়া আমরা আমাদের শান্তি এবং আত্মসংযমের দুর্দ্ধর্ষ, অশান্ত সদাব্যস্ত শত্রু কামকে বিনাশ করিতে পারি।

বুদ্ধির ক্রিয়া দুই প্রকার হইতে পারে। বুদ্ধি নিম্নে ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতির খেলার দিকে অথবা উর্দ্ধে চৈতন্যময় শান্ত আত্মার পবিত্র স্থায়ী শান্তির দিকে যাইতে পারে। প্রথম গতি বহির্মুখী। প্রথম ক্ষেত্রে মানুষ ইন্দ্রিয় বিষয়ের অধীন হয়, বাহ্যস্পর্শ লইয়াই থাকে। এই জীবন কামনায় জীবন। কারণ, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অশান্তি সৃষ্টি করে এমন কি অনেক সময় অত্যুগ্র উপদ্রবের সৃষ্টি করে, ঐ সকল বিষয়কে লাভ ও ভোগ করিবার জন্য বাহিরের দিকে প্রবল ঝোঁক উৎপন্ন করে এবং তাহারা মনকে হরণ করিয়া লয়, বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি—"যেমন বায়ু

নৌকাকে সমুদ্রে বিশৃঙ্খল ভাবে ভ্রমণ করায়;" ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ উপদ্রবে মন যেমন কাম, বাসনা, উদ্বেগ, তীব্র লোভের অধীন হইয়া পড়ে তেমনই এই কামাধীন্ মন বুদ্ধিকেও টানিয়া লয়—তখন বুদ্ধি শান্ত বিচার হারাইয়া ফেলে—সংযম হারাইয়া ফেলে। বুদ্ধির এইরূপ নিম্নগতির ফলে আত্মা প্রকৃতির গুণত্রয়ের চিরদ্বন্দ্বের অধীন হইয়া পড়ে; অজ্ঞান, মিথ্যা ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন, শোক দুঃখের অধীনতা, আসক্তি কাম—এই সকল নিম্নগামিনি বুদ্ধির পরিণাম, ইহাই সাধারণ অজ্ঞানী অসংযমী মানুষের দুঃখময় জীবন। বেদবাদীদের ন্যায় যাহারা ইন্দ্রিয়ভোগকেই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য করে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই আত্মার শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে তাহারা মানুষকে ভ্রান্ত পথ দেখায়। বাহ্যবিষয়ের অধীনতা ছাড়া অন্তরের ভিতর যে আত্মারাম তাহাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং শান্তি ও মুক্তির উচ্চ উদার অবস্থা।

অতএব, বুদ্ধির যে ঊর্দ্ধ অন্তর্মুখী গতি তাহাই আমাদিগকে দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত, স্থিরনিশ্চয়তা ও অধ্যবসায়ের (ব্যবসায়) সহিত অবলম্বন করিতে হইবে; বুদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে পুরুষের শান্ত আত্মজ্ঞানে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। প্রথমে যে আমাদিগকে কামনা ছাড়িতে চেষ্টা করিতেই হইবে তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ ইহাই সমস্ত অশুভ ও দুঃখের সমগ্র মূল; এবং কামনা ছাড়িতে হইলে কামনার কারণেরও শেষ করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্যবস্তু ধরিতে ও ভোগ করিতে ছুটিয়া যায় তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে চায় তখন তাহাদিগকে ফিরাইতে হইবে, তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া আনিতে হইবে —কচ্ছপ যেমন স্বীয় করচরণাদি অঙ্গ বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ-মধ্যে রাখে তেমনই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের মূলে রাখিতে হইবে, মনে বিলীন

করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মাতে এবং আত্মজ্ঞানে বিলীন করিতে হইবে, প্রকৃতির কার্য্য দর্শন করিতে হইবে কিন্তু তাহার অধীন হওয়া চলিবে না—বাহ্যজগৎ যাহা দিতে পারে এমন কোন বস্তু কামনা করা চলিবে না।

পাছে বুঝিতে ভুল হয় তাই পরক্ষণেই ভগবান নির্দ্দেশ করিলেন যে তিনি বাহ্য কঠোরতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শারীরিক প্রত্যাখ্যান শিক্ষা দেন নাই। উপবাস, শরীরের পীড়ণ প্রভৃতির দ্বারা কঠোর তপস্বিগণ যে তপস্যা করেন তাহা ভগবানের উপদেশ নহে; ভগবান যে প্রত্যাহার ও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অন্যরূপ তাহা আন্তরিক প্রত্যাহার—কামনা পরিত্যাগ। দেহী আত্মার যে দেহ তাহার সাধারণ ক্রিয়ার জন্য সাধারণতঃ আহারের আবশ্যক। আহার পরিত্যাগ করিলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সহিত বাহ্য সংস্পর্শ দূর হয় বটে- কিন্তু, যে আভ্যন্তরীন সম্বন্ধের জন্য এই সংস্পর্শ অনিষ্টজনক সেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় না। বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ, রস, তাহা থাকিয়া যায়—রাগ ও দ্বেষ থাকিয়া যায় কারণ এই দুইটিই রসের দুইটা দিক মাত্র; কিন্তু রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া বিষয় গ্রহণ করিবার যে সামর্থ্য তাহাই লাভ করিতে হইবে। নতুবা, বিষয়ের নিবৃত্তি হইবে বটে কিন্তু, মনের নিবৃত্তি হইবে না; কিন্তু, ইন্দ্রিয় সকল মনেরই ভিতরের জিনিষ এবং ভিতরে রসের শেষই আসক্তির প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু, ইহা কিরূপে সম্ভব যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবে অথচ কামনা থাকিবে না, রাগ দ্বেষ থাকিবে না? ইহা সম্ভব—পরং দৃষ্টা; পর, আত্মা, পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া এবং বুদ্ধিযোগের দ্বারা সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অথবা এক হইয়া তাহার মধ্যে বাস করিয়া ইহা সম্ভব হয়।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥২॥৫৯

—"যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত, তাদৃশ দেহাভিমানী অজ্ঞব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায় বটে, কিন্তু ভোগবিলাস নিবৃত্তি পায় না অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থাকে; পরন্তু যিনি পরমাত্মাকে দেখিয়াছেন তাঁহার অভিলাষ আপনিই নিবৃত্তি পায়।" কারণ সেই এক আত্মা শান্তিময়, আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট; আমরা যদি একবার সেই পরম বস্তুকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদের মন ও বুদ্ধি তাহাতে নিবেশ করিতে পারি তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে রাগ দ্বেষ তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দ্বন্দ্বশূন্য সেই আত্মানন্দ লাভ করিব। ইহাই মুক্তির প্রকৃত পন্থা।

আত্মসংযম, আত্মজয় যে সহজ নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যই জানে যে তাহাদিগকে কতকটা আত্মসংযম করিতেই হইবে এবং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে যত উপদেশ দেওয়া হয় এত বোধ হয় আর কোন বিষয়েই দেওয়া হয় না; কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ উপদেশ নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে দেওয়া হয় এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং সঙ্কীর্ণভাবে পালিত হয়। তবে, এমন কি যে সকল বিবেকী পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মজয়ের জন্য প্রকৃত ভাবেই যত্ন করেন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ।২।৬০

ইহার কারণ এই যে মন স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী হয়; মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতে রস পায়, সে গুলিতে নিবিষ্ট হয় এবং সে গুলিকে

বুদ্ধির একান্ত চিন্তার বিষয় এবং ইচ্ছার তীব্র আকর্ষণের বিষয় করিয়া তুলে। এইরূপে আসক্তির উদয় হয়, আসক্তি হইতে কামনা হয়; এই কামনার তৃপ্তি না হইলে দুঃখ হয়, বাধা পাইলে ক্রোধ হয়; দুঃখ ও ক্রোধ হইতে আত্মার মোহ উপস্থিত হয়—বুদ্ধি তখন শান্ত, সাক্ষী আত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ভুলিয়া যায়—প্রকৃত আত্মার স্মৃতি লোপ পায় এবং এইরূপ লোপের দ্বারা বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত হয়, এমন কি বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, কিছুকালের জন্য ইহা আর আমাদের আত্মস্মৃতিতে থাকে না—দুঃখ ক্রোধাদির আতিশয্যে ইহা অদৃশ্য হয়; আমরা আত্মা, বুদ্ধি ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তে ক্রোধ, শোক দুঃখাদিময় হইয়া উঠি।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশোঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥২।৬২।৬৩

অতএব, ইহা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া চলিবে না এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিতে হইবে কারণ ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিয়াই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৬১

শুধু বুদ্ধির দ্বারা, মানসিক সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করা সম্ভব নহে, ইহার জন্য এমন কোন বস্তুর সহিত যোগের প্রয়োজন যাহাতে, শান্তি ও আত্মসংযম স্বভাবতঃই রহিয়াছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিলে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাতে" সমর্পণ

করিলে—এই যোগ সাফল্য লাভ করিতে পারে; কারণ মুক্তিদাতা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন, তবে আমাদের মন, বুদ্ধি বা ইচ্ছা তাহা নহে—এগুলি তাঁহার যন্ত্র মাত্র। ইনি সেই ঈশ্বর, সর্ব্বতোভাবে যাহার শরণ লইবার কথা গীতার শেষে বলা হইয়াছে। এবং ইহার জন্য প্রথমে তাঁহাকেই আমাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত আত্মার স্পর্শ রাখিতে হইবে। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই বাক্যের ইহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু, গীতার যেমন ধরণ, এখানে শুধু এই অর্থের সঙ্কেতমাত্র করা হইয়াছে। যে সর্ব্বোত্তম রহস্য পরে ব্যক্ত করা হইবে তাহার সারটুকু বীজরূপে এই তিনটি কথার ভিতরে রহিয়াছে—যুক্ত আসীত মৎপর।

যদি এইরূপ করা হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার বশীভূত করিয়া বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করা যায়—তাহাদের স্পর্শ গ্রহণ করা যায়, তাহাদের উপর কার্য্য করা যায়—সেই সকল বিষয়ের ও তাহাদের প্রতি রাগদ্বেষের অধীন হইতে হয় না,—ঐ অন্তরাত্মা আবার পরমাত্মার, পুরুষের অধীন হয়। পরে বিষয় সমূহের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়গণ রাগদ্বেষের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে, কামনা বাসনার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে এবং মানুষ সুখময় শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥২।৬৫

—আত্মপ্রসাদ জন্মিলে ইহার আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বদুঃখের নিঃশেষে নাশ হয়; এই আত্মপ্রসাদ, বুদ্ধির এই শোকশূন্য প্রতিষ্ঠা এবং আত্মজ্ঞান ইহাকেই গীতাতে সমাধি নাম দেওয়া হইয়াছে।

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাঁহার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহার শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে এমনকি তাহার শরীর দগ্ধ করিলেও তাঁহার জ্ঞান হইবে না ; সাধারণতঃ সমাধি বলিতে এই অবস্থায়ই বুঝায়—কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে, ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা, সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয়, তাহারা মনে প্রবেশ করিতে পারে না ; যে আন্তরিক অবস্থা হইতে এইরূপ মুক্তির উৎপত্তি—শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, সংসারে বিপদ সম্পদে অবিচলিত মন সহ আত্মার আত্মাতেই যে তৃপ্তি তাহাই প্রকৃত সমাধির লক্ষণ। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিরে কার্য্য করিলেও তাঁহার ভাব অন্তর্মুখী ; বাহিরের বস্তুর দিকে যখন তিনি তাকাইয়া থাকেন তখনও আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন ; যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায় যে তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন সম্পূর্ণ-ভাবে ভাগবতের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকে। সাধারণ মানুষের ন্যায়ই অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন যে এই মহান সমাধির এমন বাহ্যিক লক্ষণ কি আছে যাহার দ্বারা এই অবস্থা চিনিতে পারা যায় :--

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ২।৫৪

হে কেশব, [illegible] অবস্থিত স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ [illegible] কিরূপ চলেন ?

কিন্তু, এরূপ কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না এবং গুরু তাহা দিবার চেষ্টাও করিলেন না ; কারণ, এরূপ অবস্থায় একমাত্র নিদর্শন আভ্যন্তরীন। যে আত্মা মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার মহান ভাব সমতা

এবং যে লক্ষণ দেখিয়া এই সমতার অবস্থা বুঝা যায় সে সবই আন্তরিক (Subjective)।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২।৫৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তি ভয় ও ক্রোধ শূন্য যে মুনি তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাতে প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়া নাই, দ্বন্দ্ব নাই—তিনি তাঁহার প্রকৃত সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পাওয়া থাকা কিছু নাই, তিনি আত্মাকে পাইয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥ ২।৪৫

একবার যদি আমরা আত্মাকে পাই তখন সকল বস্তুই আমাদের পাওয়া হয়।

তথাপি তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হন না। এই স্থানেই গীতার মৌলিকত্ব ও শক্তি যে এইরূপ সমাধির কথা বলিয়া এবং মুক্ত আত্মার নিকট প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার শূন্যতার কথা বলিয়াও গীতা কর্ম্ম সমর্থন করিয়াছে, কর্ম্ম করিবার আদেশ দিয়াছে। যে সকল দর্শন শাস্ত্র শুধু কঠোর তপস্যা ও নীরবতার প্রশংসা করিয়া লোককে কর্ম্মহীন করিয়া তুলে গীতা তাহাদের সেই দোষ এইরূপে সংশোধন করিয়াছে; আজ আমরা দেখিতে পাই যে সেই সকল দর্শন মত এই দোষ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২।৪৭

তোমার কর্ম্মে অধিকার, কিন্তু কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে

নহে, কর্ম্মের ফলের জন্যই যেন কর্ম্ম করিও না, কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

অতএব বেদবাদীরা কামনার সহিত যে কার্য্য করেন সেরূপ কার্য্য এখানে অনুমোদিত হয় নাই; যে সকল রজোগুণসম্পন্ন লোক কর্ম্মে তৃপ্তি পায়, সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবার জন্য যাহাদের মন অস্থির তাহাদের মত কর্ম্ম করিতেও গীতা এখানে উপদেশ দেয় নাই।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮

যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। চিত্তের এইরূপ সমতার নাম যোগ। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোনটা অপেক্ষাকৃত ভাল বা মন্দ, তাহা বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, পাপের ভয় থাকিলে, পুণ্যের দিকে কঠিন চেষ্টা করিতে হইলে কাজ করা বিপদ হইয়া উঠে। কিন্তু, যে মুক্ত পুরুষ তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছেন তিনি ইহ সংসারেই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।

কারণ, তিনি পাপ পুণ্যের উপরে যে নীতি তাহাতে উঠেন—সেই নীতি আত্মজ্ঞানের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ কামনাশূন্য কর্ম্মের কোন স্থিরনিশ্চয়তা বা কার্য্যকারীতা থাকিতে পারে না, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য না করিলে সে কার্য্য ভাল হইবে না, উদ্ভাবিনী শক্তিরও সম্যক বিকাশ হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; যোগস্থ হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা শুধু সর্ব্বোচ্চ নহে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসঙ্গত—সাংসারিক ব্যাপারেও এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক শক্তি সম্পন্ন ও কার্য্যকরী; কারণ সর্ব্ব কর্ম্মের যিনি অধীশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম্ম আলোকিত। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু, দুঃখ যন্ত্রণাময় মানব জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই যে যোগীর লক্ষ্য বলিয়া সকলে স্বীকার করেন—সাংসারিক কর্ম্ম করিতে যাইলে কি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না? না, তাহাও হইবে না; যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের সহিত যোগে কর্ম্ম করেন তাঁহারা জন্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন—সেখানে শোকদুঃখময় মানব জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥২।৫১

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হন তাহা হইতেছে ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা; তিনি ব্রহ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হন। সংসার বদ্ধ জীবের যে অবস্থা, যে জ্ঞান যে, অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি তাহা তাহার বিপরীত। এই যে দ্বন্দ্বময় জীবন তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ—এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, তাহাদের চেতনা—এই অবস্থাতেই তাহারা কার্য্য করিবার, জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পায়—এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রি স্বরূপ আত্মার কষ্টকর নিদ্রা এবং অন্ধকার স্বরূপ; তাহাদের যাহা নিদ্রার অবস্থা, যাহাতে সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন; সেই অবস্থাতেই তাঁহার প্রকৃত জীবন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল দিবস।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥২।৬৯

—"সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ সেই রাত্রিতে জিতেন্দ্রিয় যোগী জাগ্রত থাকেন; যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিগণ জাগিয়া থাকে, স্থিত প্রজ্ঞের তাহা রাত্রি স্বরূপ।"—সংসারবদ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্দ্দমাক্ত সামান্য জলের মত—কামনার সামান্য বেগেই বিচলিত হইয়া উঠে; যোগী চেতনার বিশাল সমুদ্রের ন্যায়—সকল সময়েই তাহা পুরিত হইতেছে তথাপি তাহা আত্মার বিরাট শান্তিতে নিথর, নিশ্চল; সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করে, তেমনই সংসারের সমস্ত কামনা তাঁহাতে প্রবেশ করে—তথাপি তাঁহার কোন কামনাই নাই এবং তিনি বিন্দু মাত্র বিচলিতও হ'ন না—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥২।৭০

যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, সাধারণ ব্যক্তিরা আমি, আমার, তোমার, এই সকল দুঃখদায়ক জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু যোগী ব্যক্তি সর্ব্বত্র যে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক এবং তাঁহাতে "আমি" বা "আমার" এরূপ ভাব নাই।—তিনি অপরের ন্যায়ই কার্য্য করেন এবং বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া বিচলিত হন না; তিনি সেই একের ভিতর নিজের ব্যক্তিত্ব, আমিত্ব নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই একত্বের মধ্যে তিনি

বাস করেন এবং মৃত্যুকালে সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥২।৭২

গীতায় এই যে নির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা বৌদ্ধমতানুযায়ী আত্মার লোপ সাধন নহে; ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্বাকে সেই এক অনন্ত অপৌরুষেয় সত্বার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে গীতাতে নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।

এইরূপে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তকে সূক্ষ্মভাবে মিশাইয়াই গীতাশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা মোটেই সব নহে; কার্য্যতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্ব সাধন যে অবশ্য প্রয়োজন তাহাই এখানে সাধিত হইয়াছে; আত্মার চরম পূর্ণতার যে তৃতীয় উপাদান—ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, এপর্য্যন্ত কেবল তাহার সঙ্কেত মাত্র করা হইয়াছে।

PUBLIC LIBRARY * EST. 1886